জাতীয় সমস্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ

"যে শক্তিমান্ মহাপুরুষ পৃথিবী আলোড়ন করিয়া উহার সংস্কার সাধন করিতে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক নির্ধারিত, সেই স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্য বিজয়াভিযান ভারতের কেবল নবজাগরণ নহে, পরন্তু পুনরভ্যুদয় এবং বিশ্ববিজয়েরও প্রথম প্রত্যক্ষ নিদর্শন।"

—শ্রীঅরবিন্দ

স্বামী সুন্দরানন্দ

২১, বৃন্দাবনবসু লেন,
কলিকাতা-৬
বিবেকানন্দ সোসাইটি হইতে
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্তৃক প্রকাশিত

১৩৬৩

মুদ্রাকর—শ্রীঅজিতকুমার লাহিড়ী
কলিকাতা জব প্রিণ্টার্স
১৪/১, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

শতবার্ষিকী সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান ভারতের সর্বতোমুখী নবজাগরণের প্রধান প্রবর্তক যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্ম-শতবার্ষিকী ১৯৬৩ সনের জানুয়ারী হইতে পৃথিবীর বহু দেশে—বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং এক বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই উপলক্ষে এই অতিমানবের নাম ও ভাবের সহিত সংযুক্ত পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে এই সুবিখ্যাত যুগচিন্তানায়ক প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল বিশেষত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভবিষ্য ভারতের ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র শিক্ষা প্রভৃতির সংস্কার-সাধনের যে সুচিন্তিত উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, ইহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ইদানীং স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনের ঐ সকল বিভাগের সংস্কার ও সংগঠন-প্রচেষ্টা পূর্ণোদ্যমে পরিচালিত হইতেছে, এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এ সম্বন্ধে যে ক্ষেত্রেই দূরদর্শী স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পিত সংস্কার-পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই, সেই ক্ষেত্রেই জাতীয় জীবন-রাগিণী বেসুরা বাজিতেছে। ফলে সেই বিষয়েই নানাবিধ জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে; এই জন্য আমাদের ন্যায় অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে, যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের যোগদৃষ্টি-সম্ভূত সংস্কার-প্রণালীই স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনের সকল বিভাগ-সংগঠনের একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। এ বিষয়ে এই যুগ-সন্ধিক্ষণে দেশের শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান্ ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের দ্বিতীয়

সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আশা করি, প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণও স্বদেশহিতৈষী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক সমাদৃত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বিনীত
মোড়াবাদী, রাঁচী, গ্রন্থকার
(বিহার)
২৫শে মার্চ, ১৯৬৩

প্রকাশকের নিবেদন

মঙ্গলময় শ্রীভগবানের অশেষ কৃপায় স্বামী সুন্দরানন্দ-প্রণীত 'জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাকে 'স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংস্করণ' বলা যাইতে পারে। ১৯৬৩ সালের ১৭ই জানুয়ারী হইতে সমগ্র ভারতবর্ষে তথা সমগ্র বিশ্বে স্বামীজীর শতবার্ষিকী সোৎসাহে উদ্‌যাপিত হইতেছে। এই শুভ উপলক্ষ্যে, বিশেষতঃ আমাদের বর্তমান জাতীয় সঙ্কটে, স্বামীজীর অমরবাণীর নিত্য অনুস্মরণ ও গভীর অনুধাবন বিশেষ প্রয়োজনীয়। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সর্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা এক মহতী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইবেন এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। মুদ্রণব্যয়ের আধিক্যহেতু গ্রন্থখানির মূল্য আড়াই টাকা হইতে তিন টাকা করা হইল।

২৫শে মার্চ, ১৯৬৩ বিনীত
বিবেকানন্দ সোসাইটি, প্রকাশক
২১, বৃন্দাবন বসু লেন,
কলিকাতা-৬

নিবেদন

উনবিংশ শতাব্দীতে পরাধীনতার পূর্ণ প্লাবনের সময় ভারতের অধিকাংশ নরনারীর চক্ষু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বৈদ্যুতিক ঔজ্জ্বল্যদর্শনে যথার্থই ঝলসিয়া গিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দেশের পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত নেতৃবৃন্দের অনেকেই সকল বিষয়ে অন্ধভাবে পাশ্চাত্ত্যের অনুসরণকে জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায়রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই কালে ভারতে দাসত্বের সম্মান হইয়াছিল রাষ্ট্র বা রাজকার্যের নামে, ভেদ-বিরোধ-অনৈক্যের প্রচলন হইয়াছিল সমাজের নামে, পাশ্চাত্ত্যের হুবহু অনুকরণের রীতি হইয়াছিল সভ্যতার নামে এবং মহাতামসিকতার চলন হইয়াছিল ধর্মের নামে। ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী বিপর্যয়ের এই দুর্দিনে যুগধর্মাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য ভোগবিলাসান্ধ আত্ম-বিশ্বাসহীন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি প্রভৃতির মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া উহাদের প্রতি তাঁহাদের অনেকের আন্তরিক শ্রদ্ধা-আকর্ষণে কৃতকার্য হন। তিনি গৌরবময় অতীত অপেক্ষাও সকল বিষয়ে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ ভারতের এক চমৎকার আলেখ্য দেশের শিক্ষিত

যুবকগণের সম্মুখে ধারণ করিয়া ঐ মহান আদর্শলাভে তাঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করেন। এই সঙ্গে তিনি অতীত ও বর্তমান ভারতের জাতীয় জীবনের দোষ ত্রুটি ও সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা করিয়া অতীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য-সাধনে উহাদের সমাধানের উপায় দেখান। কেবল ভারতের নয়, পরন্তু বিশ্বমানবের প্রধান প্রধান সমস্যা এবং উহাদের সমাধান-সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত অর্ধশতাব্দীর অধিক কালের পুরাতন হইলেও অদ্যাবধি নূতন এবং সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই সম্বন্ধে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু অননুকরণীয় অনবদ্য ভাষায় বলিয়াছেন "আপনারা স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে বিস্ময়কর এই দেখিতে পাইবেন যে, ঐগুলি পুরাতন নয়। উহা ৫৬ বৎসরের পুরাতন হইলেও আজও নূতন। কারণ তিনি যাহা লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ও পৃথিবীর সমস্যাসমূহের অনেক মূলতত্ত্ব বিশ্লেষিত হইয়াছে। এইজন্য ইহা পুরাতন হয় নাই। আপনারা এখন পাঠ করিলেও ইহাকে নূতন মনে করিবেন। তিনি আমাদিগকে এমন কতকগুলি জিনিস দিয়াছেন, যাহা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়া আমরা গৌরববোধ করি। তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। আমাদের দুর্বলতা ও অকৃতকার্যতার কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। স্বামীজী কিছুই গোপন রাখেন নাই। বস্তুতঃ আমাদের দোষগুলি ঢাকিয়া রাখা তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই; কেননা এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদিগকে সংশোধন করিতে হইবে। এই জন্য এই বিষয়সমূহ-সম্বন্ধে তিনি সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতেও এরূপ মহত্ত্ব পরিব্যক্ত যে,

উহা ভারতের অধঃপতনের দিনেও তাহার আদর্শকে সকলের নিকট গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছিল।" গুণগ্রাহী পণ্ডিতজীর এই সুচিন্তিত অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।)

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান প্রধান ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সমস্যা এবং উহাদের সমাধান-সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, উহাই অতি সংক্ষেপে এই পুস্তকে উল্লেখ করা হইল। ইহাতে আমাদের জাতীয় গুণাবলীর তুলনায় দোষ-ত্রুটি এবং উহাদের সংশোধনের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে এই জন্য যে, বর্তমানে আমাদের জাতীয় গুণকীর্তন অপেক্ষা দোষ-সংশোধনের প্রয়োজনই বেশী। এখন স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবন নূতন করিয়া সংগঠন এবং জাতীয় সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা দিকে দিকে পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। এক এক সংঘ আমাদের জাতীয় জীবন এক এক ভাবে গঠন এবং জাতীয় সমস্যাগুলির এক এক ভাবে সমাধানের চেষ্টা করিতেছে। আমরা এই যুগ-সন্ধিক্ষণে এ বিষয়ে সকলকে স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদ পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

এই পুস্তকে আলোচিত বিষয়সমূহ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' মাসিকপত্রে সম্পাদকীয় প্রবন্ধরূপে সূত্রাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐগুলিই সর্বাংশে পরিবর্ধিত ও স্বাধীন ভারতের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করা হইল। ইহার সমগ্র স্বত্ব আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ ও উহার ব্যয়নির্বাহকল্পে 'কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি'কে দেওয়া হইল।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে এই গ্রন্থ-প্রকাশনে অধ্যাপক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম্‌-এ, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত বি-এল্‌, শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, শিল্পী শ্রীঅনাদিরঞ্জন দাস প্রভৃতি নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য আমি এই হিতৈষিগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি

বিনীত

সুন্দরানন্দ

সূচীপত্র



জাতীয় জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ

ইতিহাস পাঠ করিলে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, যুগে যুগে ধর্মভূমি ভারতবর্ষে নব নব ধর্মজাগরণের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে নূতন নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। পৌরাণিক যুগ পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক যুগের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেও দেখা যায়, ভগবান বুদ্ধ ও মহাবীর-প্রবর্তিত অভিনব ধর্মজাগরণের ব্যাপকতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ এবং ইহার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে বহু স্বাধীন বৌদ্ধ ও জৈন রাজ্য, আচার্য শংকর-প্রচারিত নব হিন্দুধর্ম প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিলে সুঙ্গ কণ্ব অন্ধ্র কেশরী গুপ্ত প্রভৃতি স্বাধীন হিন্দুসাম্রাজ্য, সাধু তুকারাম ও রামদাস স্বামীর প্রচারিত ধর্মের প্রেরণায় ছত্রপতি শিবাজীর চেষ্টায় স্বাধীন

মহারাষ্ট্ররাজ্য, গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দসিংহের প্রচারিত ধর্মজাগরণকে কেন্দ্র করিয়া পঞ্চনদে স্বাধীন শিখরাজ্য, দক্ষিণ-ভারতে আপ্পারস্বামী সুন্দরমূর্তি সম্বন্ধর মাণিক্য বাসকর প্রমুখ তেষট্টি জন 'নায়েনার' বা নেতৃস্থানীয় শৈবাচার্য এবং রামানুজ তিরুমঙ্গল তিরুপ্পন-আলোয়ার নম্পোদোয়ান প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য-প্রবর্তিত ধর্মজাগরণ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পল্লব পাণ্ড্য চোল চালুক্য প্রভৃতি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল। ভারতেতিহাসের এই চিরন্তন নীতির অনুসরণে ইংরেজের আমলেও রাজা রামমোহন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এবং এই যুগধর্মাচার্যগণের পদাঙ্কানুসরণে অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের প্রচারিত নবধর্মজাগরণকে আশ্রয় করিয়া ভারতে জাতীয় জাগরণ উপস্থিত হয়। উহার প্রেরণাই যে ভারতে সদ্যঃস্থাপিত গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রের মূলে বিদ্যমান, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। যাঁহারা ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা সকলেই ইহার সত্যতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

(উনবিংশ শতাব্দীতে পরাধীনতার তমসাচ্ছন্ন সুপ্ত ভারতে ব্রাহ্মধর্ম-প্রবর্তক রাজা রামমোহন ছিলেন প্রথম জাগ্রত মহাপুরুষ। পরবর্তী কালে তাঁহার মতানুসরণে ব্রহ্মানন্দ

কেশবচন্দ্র 'নব বিধান' স্থাপন করেন। ঠিক এই সময়ে পাঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দ কর্তৃক আর্যসমাজ স্থাপিত হয়। এই তিনজন মনীষীই ধর্মজাগরণ-সহায়ে ভারতে জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত করেন। কিন্তু এই মহাপুরুষগণের প্রবর্তিত ধর্মজাগরণ একশ্রেণীর পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই আন্দোলনের সহিত দেশের জনগণের যোগসূত্র রক্ষিত হয় নাই বলিয়া তাহারা ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইবার সুযোগ পায় নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যুগধর্মাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত সর্বধর্মসমন্বয়কে অবলম্বন করিয়া আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ যে ধর্মজাগরণ আনয়ন করেন, ইহা শিক্ষিত শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও বিস্তৃত হইতে থাকে। শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব সাফল্য হইতে ইহার সূচনা হয়। তথায় তাঁহার হিন্দুধর্ম-মাহাত্ম্যকীর্তন পাশ্চাত্ত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের করতালি অর্জন করে। এই সংবাদ শুনিয়া পরাধীন ভারতবাসীর আত্মসম্বিৎ প্রথম জাগিয়া উঠে। এই সময় হইতেই ভারতে সর্বতোমুখী জাতীয় জাগরণ আরম্ভ হয়। ভারতবাসী মনেপ্রাণে অনুভব করে যে, জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে তাহাদের দান করিবার যে অমূল্য ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি আছে, তাহা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির নাই।

এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় ভারতে এক অশ্রুতপূর্ব জাতীয় জাগরণ উপস্থিত হয়। রামমোহন কেশবচন্দ্র দয়ানন্দ প্রভৃতি বেদাশ্রিত হিন্দুধর্মের অসংখ্য মত ও পথের মধ্যে এক একটি মত ও পথ মাত্র গ্রহণ করিয়া উহাকেই একমাত্র যুগধর্ম বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু সর্বধর্মসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা ও উপদেশালোকে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃষ্টান প্রমুখ সকল ধর্মমত ও পথকেই ভগবান্‌লাভের এক একটি উপায় বলিয়া ঘোষণা করেন। এইরূপে তিনিই সর্বপ্রথমে পরস্পরবিবদমান ধর্মসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে যথার্থ ঐক্য-স্থাপন এবং হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খৃষ্টান প্রমুখ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সমবায়ে ভারতে যথার্থ গণতান্ত্রিক জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার পথ দেখান। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন এবং উহাদের সমবায়ে জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার ইহাই একমাত্র উপায়। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, অধুনা রাষ্ট্রক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ ভারতের নেতৃবৃন্দ ধর্মনিরপেক্ষতার আবরণে ধর্মক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক সর্বধর্মসমন্বয়রূপ গণতান্ত্রিক জাতীয়তা জাতীয় জীবনে সংহতি-স্থাপনের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত ধর্ম-জাগরণ কেবল ধর্মরাজ্যে গণতান্ত্রিক জাতীয়তা বা ঐক্য-প্রতিষ্ঠায়ই সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু তিনি বেদান্ত-দর্শনের দৃঢ়ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আত্মার দিক্ দিয়া পৃথিবীর সকল মানুষকে এক ও অভিন্ন এবং নরমাত্রকেই নারায়ণ-জ্ঞানে সম্মান-প্রদর্শন এবং জীবমাত্রকে শিবজ্ঞানে সেবা করিবার মাহাত্ম্য অতি উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করেন। তিনি দেশমাতৃকার মধ্যে, জাতির মধ্যে, সমাজের মধ্যে ও ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরকে সেবা করিতে উদাত্ত কণ্ঠে উপদেশ দেন। তাঁহার প্রচারিত এই মহান্ আদর্শ কার্যে পরিণত করিবার জন্য দেশময় অসংখ্য সংঘ গড়িয়া উঠে এবং দিকে দিকে আন্দোলন উপস্থিত হয়। (তাঁহার অনুপ্রেরণায় ভারতের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সমবায়ে জাতীয়তা-স্থাপন, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-অর্জন, অর্থনীতিক মুক্তিসাধন, সমাজের সংস্কারবিধান, অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ, অবনত ও অনুন্নত জাতিসমূহের উন্নয়ন, শিক্ষা-বিস্তার, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, দরিদ্র-নারায়ণসেবা, দুর্ভিক্ষ বন্যা ও মহামারীতে সংঘবদ্ধ-ভাবে জনসেবা প্রভৃতির জন্য ভারতব্যাপী শত শত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং সহস্র সহস্র নিঃস্বার্থ কর্মী কর্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। প্রবুদ্ধ ভারতের সাহিত্য শিল্প স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা সংগীত প্রভৃতি এক অপূর্ব জাগরণে সঞ্জীবিত হয়। নবজাগ্রত ভারতের প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের

প্রেরণাই যে ভারতের বহুমুখী জাতীয় জাগরণের মূলে বিদ্যমান, ইহা বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃত। এ সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন, "সাধারণ অর্থে রাজনীতিজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝায়, তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) তাহা ছিলেন না বটে, তথাপি আমি মনে করি, তিনি ভারতের বর্তমান জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম মহান্ প্রবর্তক (ইচ্ছা করিলে আপনারা অন্য কোন শব্দও ব্যবহার করিতে পারেন) ছিলেন। পরবর্তী কালে যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি এই আন্দোলনে কমবেশী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আধুনিক ভারতকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করিয়াছেন।"

এই অভিমতের সত্যতার প্রমাণস্বরূপে বলা যায় যে, এ যুগে "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—'আপনার মোক্ষ ও জগতের হিতসাধনের জন্য' ভারতে—বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে যে সকল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী হইয়াছেন, যে সকল যুবক দেশের স্বাধীনতা-অর্জনের জন্য অশ্রুতপূর্ব ত্যাগস্বীকার ও উৎপীড়ন-ভোগ করিয়াছেন, যে মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ শিক্ষাবিস্তার, সমাজ-সংস্কার ও দরিদ্র রুগ্ন অস্পৃশ্য প্রভৃতিকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবার জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে জীবন বিলাইয়া দিয়াছেন,

যাঁহারা সাহিত্য শিল্প চিত্রকলা স্থাপত্য ভাস্কর্য সংগীত প্রভৃতির উৎকর্ষসাধনের জন্য অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমের মর্মস্পর্শী বাণীই তাঁহাদের সকলের কর্মপ্রেরণার উৎস।

বর্তমান যুগের বিশ্ববিখ্যাত মনীষী যোগী শ্রীঅরবিন্দ যে স্বামীজি-প্রচারিত ভাবরাশি দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়াই দেশমাতৃকার সেবায় জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন, ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তৎপরিচালিত 'বন্দে মাতরম্' 'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। 'ভারতপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ' নামক গ্রন্থে আছেঃ "বিবেকানন্দের ভাবধারা, তাঁহার সেবাধর্ম্মের আদর্শ, তাঁহার স্বদেশপ্রেম শ্রীঅরবিন্দের তরুণ-চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।" স্বামীজির মহাসমাধি-লাভের অনেক দিন পর শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন, "ভারতের বিরাট প্রাণপুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও স্বীকার করা যায়, তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ—নরকেশরী বিবেকানন্দ। আমরা দেখিতেছি তাঁহার প্রভাব ভারত-আত্মাকে আলোড়িত করিয়াছে। আমরা বলিবঃ বিবেকানন্দ এখনও বাঁচিয়া আছেন তাঁহার দেশবাসীর আত্মায়, দেশ-জননীর সন্তানদের আত্মায়। ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের অন্যতম প্রধান পুরোহিত মহাত্মা গান্ধীর পুণ্যজীবনও বহুবিষয়ে স্বামী

বিবেকানন্দের ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এ সম্বন্ধে মনীষী ডক্টর ফেলিক্স ভ্যাল্য়ী বলিয়াছেন, "মহাত্মা গান্ধী স্বয়ংও স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় চিন্তাধারার পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বিশ্লেষণের মহত্ত্ব অনুধাবন করিয়া তাঁহার কর্ম-প্রণালীতে উহা প্রয়োগ করিয়াছেন।" তৎপ্রবর্তিত হরিজন-সেবা ও গ্রামসংগঠন-আন্দোলন এবং ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা স্বামীজির দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রভাবান্বিত ছিল। ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের অন্যতম প্রধান পরিচালক এক-নিষ্ঠ স্বদেশ-সেবক নেতাজী সুভাষচন্দ্র ৬-৩-৩৬ তারিখে লেখককে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী, তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাবে আমার জীবনের উন্মেষ। নিবেদিতার মত আমিও মনে করি যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের (স্বরূপের) দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজি জীবিত থাকিতেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁহাকে আমি নিশ্চয়ই গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হউক, যত দিন জীবিত থাকিব, ততদিন যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব—একথা বলাই বাহুল্য।" তিনি তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান্ পিলগ্রিম্' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রতিকৃতি ও উপদেশ উভয়ের পরিপূর্ণ বিকশিত

ব্যক্তিত্ব লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে সমস্যা-সমূহ আমার মনকে অনিশ্চিতভাবে আলোড়ন করিতেছিল এবং যেগুলির সম্বন্ধে পরে আমি অবহিত হই, উহাদের সন্তোষজনক সমাধান তাঁহার মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম।" এইভাবে সেকালে ভারতের প্রায় সকল স্বদেশ-প্রেমিকই স্বামীজির ভাব দ্বারা কম-বেশী প্রভাবিত ছিলেন) ভারতের জাতীয় জাগরণ-প্রভাতে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ জাতীয়তা প্রচার করিয়াছেন, এরূপ আর কেহ করেন নাই। ('সাইমন কমিশন' ও 'রাউলাট কমিটি'র রিপোর্টে এবং কংগ্রেসের ইতিহাসে তাঁহাকে জাতীয় জাগরণের প্রবর্তক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে) প্রকৃতপক্ষেও তাঁহার গ্রন্থরাজি বক্তৃতা-সমূহ পত্রাবলী এবং কথোপকথনগুলিতে যে জাতীয়তার ভাব দেখা যায়, এরূপ আর সেকালে ছিল না এবং অদ্যাবধিও এমনটি সৃষ্ট হয় নাই। ভারতের জাতীয় জাগরণের প্রস্রবণ স্বামীজির গ্রন্থাদি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন'-পত্রে প্রথমতঃ বাহির হয় এবং পরে ঐ সকল পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। এই জন্য 'উদ্বোধনে'র সহিত বাংলার জাতীয় জাগরণ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত। এই কারণে 'উদ্বোধনে'র ইতিহাসকে বাংলার জাতীয় জাগরণের প্রথম ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

লক্ষ্যের বিষয়, (যুগধর্মাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ সর্বতোমুখী জাতীয় জাগরণের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন, উহারই প্রভাব তাঁহার মহাসমাধিপ্রাপ্তির তিন বৎসর পর ১৯০৫ সনে বাংলাদেশে বিরাট স্বদেশী আন্দোলনরূপে প্রকাশ পায়। এই আন্দোলন দ্বারা যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধিলাভের এক বৎসর পূর্বে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। ইহা ক্রমে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া মহাত্মা গান্ধীর অক্লান্ত চেষ্টায় এক মহাশক্তিশালী গণ-আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহারই সাহায্যে এক অদ্ভুত উপায়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। পরাধীন অবস্থায় ভারতবাসীর অনেক বিষয়ে উন্নতিলাভের একেবারেই সুযোগ ছিল না। স্বাধীনতা লাভ করায় ভারতের সকল নরনারীর সকল বিষয়ে উন্নতিলাভের দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়াছে। এখন তাহাদের কর্মশক্তির উপরই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ভর করে।

পরাধীন ভারতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম পরাধীনতার পরিপোষক, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন, অর্থহীন দেশাচার ও লোকাচার এবং কর্মকুণ্ঠ 'লোক-দেখানো' মুক্তিকামের প্রাবল্যে মহা তামসিক আকার ধারণ করে। স্বাধীন ভারতের ধর্মকে এই সকল অনর্থ

হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে হইবে। দেশের জনগণের তামসিকতা নষ্ট করিয়া সৎকর্মাশ্রয়ে রাজসিকতা হইতে তাহাদিগকে ক্রমে যথার্থ সাত্ত্বিকতায় উপনীত করাই হইবে ইহার লক্ষ্য। মানুষের আসুরিক ভাব বিনষ্ট করিয়া দেবভাবের বিকাশ এবং মানুষের অন্তর্নিহিত সত্য শিব ও সুন্দরের প্রকাশ করিয়া সকল নরনারীকে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সাম্য মৈত্রী ও সমদর্শনে প্রতিষ্ঠিত করাই ইহার একমাত্র আদর্শ।

যুগধর্মাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ-অনুসারে এই মহান্ আদর্শে স্বাধীন ভারতের সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতিকেও পরিচালন করিতে হইবে। (পরাধীন ভারতের সমাজে মানুষে মানুষে নানা বিষয়ে অধিকারভেদ জাতিভেদ শ্রেণীভেদ ধনভেদ বিত্তাভেদ প্রমুখ মহা অনর্থকর বহুবিধ ভেদ, তৎপ্রসূত অনাচরণীয়তা অস্পৃশ্যতা ও উচ্চ-নীচভাব এবং তৎ-উদ্ভূত ঈর্ষা বিদ্বেষ ঘৃণা অনৈক্য ও অসামঞ্জস্যের অপ্রতিহত প্রাধান্য ছিল। জাত্যভিমান ধনাভিমান ধর্মাভিমান এবং তৎসঞ্জাত মানুষের প্রতি মানুষের অপমান ও অসম্মানসূচক ভাবপোষণ ও ব্যবহার ছিল সমাজের অঙ্গের ভূষণ) (স্বাধীন ভারতের সকল নরনারীকে এই সামাজিক দাসত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া স্বাধীন মানুষের উপযুক্ত সম্মান) দিতে হইবে।

জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকল নরনারীকে দেশের ভূমিজ শিল্পজ প্রভৃতি সম্পদে এবং ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ-সাধনে সমানাধিকার দান করিয়া তাহাদের জীবনের সকল বিভাগে চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রীস্থাপন স্বাধীন ভারতের প্রজা-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ। জনগণের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য খাদ্য ও বস্ত্রাদির উৎপাদন ও বিতরণ-ব্যবস্থা সমতা-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের আর্থিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে সাম্যপ্রতিষ্ঠা ইহার উদ্দেশ্য। এইভাবে স্বাধীন ভারতবাসীর জাতীয় জীবনকে সকল দিক দিয়া কার্যতঃ যথার্থ গণতন্ত্রসম্মত সমাজতান্ত্রিক আকার প্রদান করিতে হইবে। পরাধীন ভারতের রাষ্ট্র ছিল স্বেচ্ছাচার-সাম্রাজ্যবাদমূলক, জনসাধারণকে শাসনে রাখিয়া শোষণ করাই ছিল উহার পরিচালকদের কাম্য। স্বাধীন ভারতের সকল সম্পদের একমাত্র মালিক জনসাধারণ এবং তাহাদের অধিকাংশের অভিমতে এখন রাষ্ট্র পরিচালন করিতে হইবে। জাতিধর্মনির্বিশেষে দেশের সকল নর-নারীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনই ইহার একমাত্র লক্ষ্য। পরাধীন ভারতে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি সম্ভব হয় নাই। স্বাধীন ভারতকে পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহের আদর্শে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়-অবলম্বনে এই সকল বিষয়ে উন্নত হইতেই হইবে। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ

সকল বিভাগে উন্নতিলাভের যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাই যে ভারতের জাতীয় অভ্যুত্থানের একমাত্র পথ, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। স্বাধীন ভারতকে জয়যুক্ত করিতে হইলে এই পথ অবলম্বন করিতেই হইবে। তিনি যে স্বাধীন ভারতের জাতীয়তার মূর্তবিগ্রহ, প্রায় সকল বিষয়ে ভারতের জাতীয় মনের প্রতিনিধি এবং শিক্ষকস্বরূপ ছিলেন, তাহা তাঁহার প্রচারিত উপদেশ এবং প্রবর্তিত কর্মপ্রণালীতে সুস্পষ্ট। ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আবশ্যক সকল বিষয়ে তাঁহার অভিমত কেবল সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণেরই উপযোগী নয়, অধিকন্তু ইহা শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত হইলে ভারতের আধুনিক তরুণ-তরুণীগণের জীবনগঠনে নিশ্চিত সাহায্য করিবে।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ কেবল স্বদেশের উন্নতিসাধনেই দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া পৃথিবীর সকল দেশে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল আধ্যাত্মিকতা প্রচার করিতে সকলকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। সুদীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ সমৃদ্ধিলাভ করিবার এবং বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হইবার তেমন সুযোগ পায় নাই। তথাপি এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও ভারতে অনেক আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে

যুগধর্মাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অগ্রগণ্য। ইতো-মধ্যেই এই মহাপুরুষদ্বয়ের প্রচারিত আধ্যাত্মিক ভাবরাশি কেবল স্বদেশে নয়, পরন্তু বিদেশেও বহু মনীষীর শ্রদ্ধাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের বেদান্তপ্রচারের ক্রমবর্ধমান সাফল্য এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পরাধীন ভারতে ইহার সূচনা হইয়াছে, স্বাধীন ভারতে ইহার পূর্ণ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। ভারতের আধ্যাত্মিকতা পূর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এবং ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়া পৃথিবীর সকল সুশিক্ষিত নরনারীকে প্রভাবিত করিবে এবং ইহার ফলে বিশ্বমানবের মধ্যে প্রকৃত সাম্য মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "দেখিতেছি, ভারতভূমি—আমার এই জন্মভূমি বর্ত্তমান কালেও মহীয়সী রাজ্ঞীর ন্যায় অপূর্ব্ব মহিমায় মন্থর পদ-বিক্ষেপে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন আপনার বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট মহান্ ব্রত-উদ্‌যাপনের জন্য—পশুভাবাপন্ন মানবকে নররূপী নারায়ণে পরিণত করিবার জন্য। * * সমগ্র মানবজাতিকে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন করাই ভারতবর্ষের একমাত্র জীবনব্রত, তাহার চিরন্তন সঙ্গীতের সুর, তাহার অস্তিত্বের চরম লক্ষ্য ও সার্থকতা। * * আমি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিতেছি, প্রত্যেক সভ্য দেশের কোটি কোটি নরনারী ভারতবর্ষ হইতে এই অমৃত বাণী লাভ করিবার

জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, যাহা ধন-দেবতার অর্চ্চনার অনিবার্য্য পরিণামস্বরূপ জড়বাদের ভীষণ নরককুণ্ড হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে।" এই মহান্ আদর্শ কার্যে পরিণত করাতেই স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনের সার্থকতা।

ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্যে

স্বামী বিবেকানন্দ

ইতিহাস সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ দেয় যে, পৃথিবীর মধ্যে প্রাচ্য দেশসমূহ বিশ্বমানবের অমুল্য সম্পদ ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি প্রভৃতির জন্মভূমি। প্রাচ্যের মধ্যে ভারতবর্ষে এই সকল সম্পদ প্রথমে আবিষ্কৃত এবং পরে এখান হইতে অন্যান্য দেশে বিতরিত হয়। এইগুলি প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ নরনারীর জীবনে যেরূপভাবে রূপায়িত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সেরূপ সম্ভব হয় নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে বর্তমানে নিদারুণ দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার মধ্যেও অধিকাংশ ভারতবাসীর জীবন ঐ সকল অমূল্য ভাবরাশি দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত। ইহাই ভারতের চিরন্তন গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় জীবনের ভিত্তি। এ সম্বন্ধে স্বামী

বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আমাদের মাতৃভূমির মূলভিত্তি ধর্ম্ম। ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড—ইহার উপরই আমাদের জাতীয় জীবনরূপ প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত। * * তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া আবার তাহাকে নূতন খাতে প্রবাহিত করিতে ইচ্ছা কর? ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্বসূচক ধর্ম্ম-জীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি অথবা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে।" এই জন্য আমাদের মতে ধর্ম-বিবর্জিত সংস্কার বা উন্নতি ভারতের পক্ষে তাহার সত্তাকে ত্যাগ করিয়া সংস্কার বা উন্নতিসাধনের নামান্তর। ইহা রোগীকে মারিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টার ন্যায় হাস্যোদ্দীপক! অতএব ভারতবাসীকে ভারতীয় সংস্কৃতি বা ধর্মভাবাপন্ন রাখিয়াই আবশ্যক সকল বিষয়ে উন্নত করিতে হইবে।

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতেছে—ভারতে তো বহু ধর্ম, বহু দর্শন এবং বহু সংস্কৃতি আছে, ইহাদের মধ্যে কোন্ ধর্ম, কোন্ দর্শন এবং কোন্ সংস্কৃতি ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব? উত্তরে বলা যায়—এই বহু পরস্পরবিরোধী নয়, ইহারা স্ব স্ব বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াও এক আশ্চর্য সামঞ্জস্যে সমন্বিত। স্বামী বিবেকানন্দের মতে বহুত্বের মধ্যে একত্বে এবং একত্বের মধ্যে বহুত্বে ভারতীয় সকল ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতির সামঞ্জস্য

২

বিশেষভাবে পরিস্ফুট। ভারতবর্ষ সৃষ্টিব বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া উহাদিগকে একের অভিব্যক্তিরূপে দর্শন কবিতে বরাবর শিক্ষা দিতেছে। মানুষমাত্রকেই তাহার অপূর্ণ জীবনের গণ্ডি হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা, মানুষের অস্থায়ী জীবত্ব দূর করিয়া তাহাকে শাশ্বত শিবত্বদান এবং মানুষের আভ্যন্তর সত্য শিব ও সুন্দরকে তাহার ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশন, সকল ধর্মের সার্বজনীন আদর্শ। ত্যাগ সংযম পরার্থপরতা ন্যায় নীতি তপস্যা প্রভৃতি এই মহান্ আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার উপায়। আধুনিক যুগে মহাসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন এই অত্যুজ্জ্বল আদর্শের জীবন্ত বিগ্রহ। এই মহাপুরুষের জীবনে বিভিন্ন ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি আপন আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া ত্যাগ সংযম ও তপস্যাদি-আশ্রয়ে অতি আশ্চর্যরূপে সমন্বিত হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের এই জাতীয় বিশেষত্ব নির্বস্তুক বা অবাস্তব নয়, পরন্তু ইহা বস্তুতন্ত্রমূলক —বাস্তব।

এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই পৃথিবীর সকল দেশের মনীষিগণের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ ধর্মভূমি—পুণ্যভূমি নামে অভিহিত ও সম্মানিত। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "এইটি বিশেষ স্মরণ রাখিবে, যদি ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্ত্য জাতির জড়বাদসর্ব্বস্ব সভ্যতার

অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম্ম ছাড়িলে হিন্দুর জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া গেল—যে ভিত্তির উপর জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাই ভাঙ্গিয়া গেল, সুতরাং ফল দাঁড়াইবে—সম্পূর্ণ ধ্বংস।" ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট জানা যায় যে, ভারতবর্ষ তাহার জাতীয় জীবনের ধর্মরূপ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য-সাধন-মূলে যুগে যুগে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা সংস্কার বরণ করিয়াই অনেক প্রলয়ঙ্কর অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লবের মধ্যে আজও প্রহ্লাদের ন্যায় অক্ষত শরীরে বাঁচিয়া আছে। সুতরাং ইহাই তাহার ভবিষ্যতেও বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র উপায়। স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনের সকল বিভাগের সংস্কার ও সংগঠনের আয়োজন চলিতেছে। এইজন্য আমরা পুনরায় এই উপায়ের প্রতি দেশবাসীর সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(গভীর পরিতাপের বিষয় যে, ইদানীং এক শ্রেণীর অদূরদর্শী সংস্কারকগণ রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক উন্নতির পরিপন্থিজ্ঞানে ভারতের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যরূপ ধর্মের বিরুদ্ধেই প্রথম অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ ধর্মের মোহ—পরকালের মৃগতৃষ্ণিকা ত্যাগ করিয়াই জড়জগতে অসাধারণ

উন্নতি লাভ করিয়াছে, সুতরাং ভারতবর্ষকেও জড়জগতে উন্নতিলাভের জন্য কল্পিত ধর্মের মোহ একেবারে ছাড়িতে হইবে! এই মতবাদিগণকে লক্ষ্য করিয়া বহু বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হচ্ছে, সাবধান!"

পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা সকলেই স্বামীজির এই সতর্ক বাণীর মর্ম মনেপ্রাণে বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, ভোগবিলাসের উচ্চশীর্ষে আরোহণ করিয়াও অত্যুন্নত বলিয়া গর্বিত পাশ্চাত্ত্য জাতি-সমূহের ঘরে-বাহিরে শান্তি নাই—সুখ নাই। জগতের সকল দুর্বল জাতির সকল সম্পদ আপনাদের ভোগে নিবেদন করিয়াও তাহারা অতৃপ্ত! বর্তমানে ভোগের প্রতিযোগিতা করিয়া তাহারা বারুদের স্তূপের উপর উপবিষ্ট! অদূর ভবিষ্যতে একটু অগ্নিসংযোগ হইলেই যে তাহাদের ভোগসর্বস্ব জাতীয় জড়বাদের জতুগৃহ ভস্মে পরিণত হইবে, ইহার সকল লক্ষণ তাহাদের সর্বাঙ্গে সুপ্রকট। এই দৃশ্য দেখিয়া বহুকাল পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "যদি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা

আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই সমূলে বিনষ্ট হইবে।" পাশ্চাত্ত্যের বর্তমান পরিস্থিতি দেখিয়া বিশ্বের বিশেষজ্ঞগণ সমস্বরে বলিতেছেন যে, বিশ্বময় ভোগের উপকরণ লইয়া পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের মধ্যে যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে, ইহারই ফলে তাহাদের ভোগৈকলক্ষ্য জড়-সভ্যতা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল, রোমা রোলাঁ, সার্ ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজব্যাণ্ড, ওয়েলস্, ক্রিষ্টফার ইশারউড্, জেরাল্ড হার্ড প্রমুখ মনীষীর অভিমতের ভিতর দিয়া একথার সত্যতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। চক্ষুর সম্মুখে প্রতীচ্য জাতিসমূহের এই অবস্থা দেখিয়াও তাহাদের ধর্ম নীতি সংযম প্রভৃতি-বিবর্জিত জড়বাদের অন্ধ অনুকরণকেই জাতীয় উন্নতির উপায় বলিয়া যাঁহারা প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা জানেন না যে, অমৃতভ্রমে কিরূপ সাংঘাতিক হলাহল দেশবাসীকে পান করিতে বলিতেছেন!

ইহা এখন অতি স্পষ্ট যে, পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ তাহাদের জাতীয় ভোগকে মহদুদ্দেশ্যে পরিচালিত করিতে অসমর্থ হইয়াই ধ্বংসের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, অতীত কালে পৃথিবীর কয়েকটি জাতি ইন্দ্রিয়-ভোগকে তাহাদের জাতীয় জীবনের একমাত্র আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া কিছুকাল জগৎ-রঙ্গমঞ্চে মহাশক্তির

অভিনয় দেখাইয়াও চিরতরে উৎসন্ন হইয়াছে! তাহাদের অস্তিত্ব বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের গভীর গবেষণার বিষয়! পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষ ধর্ম ত্যাগ ও সংযমকে তাহার জাতীয় জীবনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া যে আজ পর্যন্তও কেবল বাঁচিয়াই আছে তাহা নহে, অধিকন্তু তাহার সর্বাঙ্গে নব জাগরণের মঞ্জরী পরিস্ফুট। (সর্বত্র দেখা যায় যে, জাতি ও ব্যক্তি ধর্ম ত্যাগ সংযম প্রভৃতি অবলম্বন করিলে আখেরে লাভবান্ হয়। পক্ষান্তরে, অসংযত উচ্ছৃঙ্খল ভোগ ও অসংযমের দিকে ধাবিত জাতি ও ব্যক্তি কিছু কাল তেজস্বী ও শক্তিমান্ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পরিণামে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবাসী যে ঘরে-বাহিরে অসংখ্য বিপ্লবের মধ্যেও আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহার কারণ এইখানে।) সত্য বটে, ধর্মকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকায় ধর্মজ্ঞানহীন পরস্বাপহারী সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহ ভারতের বক্ষের উপর দিয়া বারংবার রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করিবার সুযোগ পাইয়াছে, কিন্তু ইহাতেও ভারতবাসী মরে নাই। তাহাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ ধর্ম তাহাদের ভোগকে ত্যাগের মহিমময় আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ঈশোপনিষৎ বলেন, "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্"—ত্যাগবুদ্ধি-

প্রণোদিত হইয়া ভোগ কর, কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।' হিন্দুশাস্ত্রের এই মহান্ উপদেশমূলে হিন্দু-জাতির ভোগ ত্যাগবুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত ছিল বলিয়াই তাহারা অসাধারণ ক্ষমতা সত্ত্বেও ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কখনও কোন জাতিকে অধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ করে নাই এবং কোন দেশের ধর্ম সংস্কৃতি কৃষি শিল্প বেশ-ভূষা ভাষা প্রভৃতি নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে উৎসাদনের পথে পাঠায় নাই। পক্ষান্তরে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ-সম্রাট্গণের মধ্যে অনেকে ধর্ম-প্রচারক পাঠাইয়া পৃথিবীর অনেক অনুন্নত জাতিকে ধর্ম দর্শন শিক্ষা সংস্কৃতি প্রমুখ মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্রাশি অকাতরে দান করিয়াছেন, কিন্তু বিনিময়ে কিছু চান নাই। ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, ভারত তাহার ধর্ম দর্শন সংস্কৃতিরূপ বিশেষত্বসহায়ে আক্রমণকারী বিজেতা জাতিকেও প্রভাবিত করিয়াছে। বিজেতা গ্রীক শক হূন মুসলমান ইংরেজ প্রভৃতি ভারতীয় ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি দ্বারা যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কমবেশী প্রভাবিত হইয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ভারতবর্ষ বরাবর ধর্মের পতাকা ধারণ করিয়া বিশ্ববাসীকে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছে—এই পতাকা-নিম্নে সমবেত হও; ধর্মের পথ, ত্যাগের পথ, সংযমের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে। পাশ্চাত্ত্য

জাতিসমূহ জড়জগতের অনেক বিষয়ে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াও ধর্ম ত্যাগ সংযমাদির অভাবেই যে তাহাদের শক্তিমান্ ব্যক্তিগণের শক্তি, বিদ্বান্গণের বিদ্যা, ধনবান্গণের ধন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় জগদ্ধিতায়' নিয়ন্ত্রণ করিতে অসমর্থ হইয়া ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য। ইহাতে কি প্রমাণিত হইতেছে না যে, ভারতবর্ষ ধর্মকে তাহার জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া ভুল করে নাই ?

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই সকল জানিয়া শুনিয়া এবং দেখিয়াও সদ্যমুক্ত স্বাধীন ভারতের পাশ্চাত্ত্য-ভাববিমুগ্ধ আধুনিক সংস্কারকগণ আমাদের জাতীয় জীবনের চিরন্তন বিশেষত্ব ধর্ম ন্যায় নীতি সংযম প্রভৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান না করিয়াই পাশ্চাত্ত্যের হুবহু অনুকরণে ধর্মহীন রাজনীতি-আশ্রয়ে আমাদের জাতীয় জীবনের সকল বিভাগ সংস্কার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁহাদের নির্দেশে স্বাধীন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রেও সেই পরাধীন যুগের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষানীতি এখনও অনুবর্তিত হইতেছে ! এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া বৈদেশিক ডক্টর ফেলিক্স ভ্যালূয়ী বলিয়াছেন, "পরিতাপের বিষয় যে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ শিক্ষার্থিগণকে নবভারতের স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনপ্রদ ভাবরাশি শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের

চরিত্র-গঠনের কোন চেষ্টা করিতেছেন না।" ইহা শুনিয়াও আমাদের পাশ্চাত্ত্যভাবান্ধ নেতৃবৃন্দের চৈতন্যোদয় হইতেছে না। তাঁহারা ভারতের জাতীয় জীবন-গঙ্গাকে উহার উৎসে ফিরাইয়া আনিয়া পুনরায় সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত করিতে যেন বদ্ধপরিকর! ইহার বিষময় ফলও সঙ্গে সঙ্গেই ফলিতেছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই অস্বাভাবিক চেষ্টার ফলে ভারতের জাতীয় জীবনের সকল বিভাগেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, ভারতবাসীর জাতীয় জীবন-রাগিণী অনেক ক্ষেত্রে বেসুরা বাজিতেছে, জাতীয় জীবনের সুরের সঙ্গে বহুবিষয়ক সংস্কার তাল রক্ষা করিতে পারিতেছে না। এইজন্য দেশময় অধর্ম অসত্য অন্যায় দুর্নীতি স্বার্থপরতা প্রভুত্ব প্রভৃতির একচ্ছত্র রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শাসক ও শাসিতগণের এক শ্রেণী ধর্মবিবর্জিত হইয়া এই সাংঘাতিক দোষগুলি দ্বারা ইতোমধ্যেই অত্যন্ত আক্রান্ত হইয়াছেন এবং ইহা ভারতের গণ-জীবনকে ক্রমেই অধিকমাত্রায় কলুষিত করিতেছে। এই সকল কারণে জনসাধারণের দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশাও ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা দ্বারা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, দেশের গণজীবন—বিশেষ করিয়া দেশের অধিকাংশ পরিচালক শাসক ধনবান্ বিদ্বান্ শক্তিমান্ এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিষ্ঠাপরায়ণ ব্যক্তিগণের জীবন সত্য ধর্ম ন্যায় ও

নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে মানবতার দিক দিয়া অত্যন্ত দরিদ্র এবং সমগ্র জাতির মহা অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। সত্য-ধর্ম-ন্যায়-নীতিবিবর্জিত ভোগৈকলক্ষ্য রাজনীতিক মতবাদ এবং রাজনীতিক স্বাদেশিকতা দেশগত জাতিগত দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থসাধন ও প্রভুত্ব-বিস্তারের উপায়রূপে পরিণত হইয়া বিশ্বমানবের কিরূপ অকল্যাণের কারণ হয়, পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহাদের সত্য-ধর্ম-ন্যায়-নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খলভোগমূলক জাতীয়তা সংঘবদ্ধ স্বার্থপরতায় (organised selfishness) রূপান্তরিত হইয়া জগতের মহা আতংকের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং স্বাধীন ভারতবাসীকে এই অনর্থ হইতে মুক্ত রাখিতে হইলে তাহাদের জাতীয় জীবনের সকল বিভাগ সত্য ধর্ম ন্যায় ও নীতির নির্দেশে নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ আবশ্যক।

সত্য বটে, পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ সকল বিষয়ে জাগতিক উন্নতিসাধনে যেরূপ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, ভারতবাসী তাহা পারে নাই। স্বাধীন ভারতকে জগতের উন্নত ও শক্তিমান্ দেশ-সমূহের সমকক্ষ হইতে হইলে পাশ্চাত্ত্যের জাগতিক উন্নতির উপায়গুলি গ্রহণ করিতেই হইবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অভূতপূর্ব উৎকর্ষ, জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্নবিষয়ক উচ্চশিক্ষা-বিস্তার,

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি শিল্প বাণিজ্য ও কলকারখানাদি-পরিচালন, যাতায়াত ও সংবাদ আদান-প্রদানে কল্পনাতীত সুবিধাসৃষ্টি, ভোগ-সুখের শত শত উপকরণ-সরবরাহ, গণতান্ত্রিক উপায়ে সুশৃঙ্খলভাবে দেশশাসন, দেশরক্ষা ও যুদ্ধবিগ্রহের শত শত উপাদান-আবিষ্কার, দেশের জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান-উন্নয়ন, জনগণের জন্য স্বাস্থ্যকর আবাস, পুষ্টিকর খাদ্য, রোগে উত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দান। স্বাধীন ভারতের পক্ষে এই দানগুলি গ্রহণ কেবল আবশ্যক নয়, পরন্তু অপরিহার্য। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বমানব-সভ্যতার উৎকর্ষ-সাধনে পাশ্চাত্ত্যের এই অমূল্য অবদান-সমূহের যেমন প্রশংসা করিয়াছেন, এই সকল সত্য-ধর্ম-ন্যায়-নীতিবর্জিত ভোগলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ইহাদের আনুষঙ্গিক কুফলগুলিরও তেমন নিন্দা করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ জাগতিক উন্নতিক্ষেত্রে অশ্রুতপূর্ব উৎকর্ষ লাভ করা সত্ত্বেও তাহাদের ধর্মনীতিহীন উচ্ছৃঙ্খল ভোগ কেবল তাহাদের নয়, অধিকন্তু বিশ্বমানবের সুখ-শান্তি-পথের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য দূরদর্শী স্বামীজি পাশ্চাত্ত্যের এই সাংঘাতিক ত্রুটিগুলি পরিহার করিবার একমাত্র উপায়রূপে তাহাদের সকলবিষয়ক জাগতিক উন্নতির অন্ধ অনুকরণ না করিয়া উহাদিগকে ভারতের জাতীয় জীবনের

বৈশিষ্ট্য ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী সংযম প্রভৃতির সঙ্গে খাপ-খাওয়াইয়া গ্রহণ করিতে দেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্যের জাগতিক উন্নতি পূর্ণমাত্রায় প্রবর্তিত হউক, সর্বাঙ্গসুন্দর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠুক, খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদির উৎপাদন ও বিতরণ-ব্যবস্থা পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সাম্যনীতিমূলে পরিচালিত হউক, ভোগাধিকারবৈষম্যশূন্য চূড়ান্ত শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া উঠুক, ইহাতে ভারতের উপকার ভিন্ন অপকার এবং উন্নতি ভিন্ন অবনতি হইবে না। কিন্তু এই সকল সংস্কার তাহার জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী সংযম প্রভৃতির অনুগত করিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। ইহাই ভারতের জাতীয় জীবনের সকল সমস্যা-সমাধানের একমাত্র উপায়। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার, তাহা শিক্ষা কর; কিন্তু মনে রাখিও যে, এইগুলিকে আমাদের জাতীয় জীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে। তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্ব্বমহিমমণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে। আমার দৃঢ় ধারণা, শীঘ্রই সেই শুভদিন আসিতেছে। * * হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নহে।

আমাদের কার্য্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ঐ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র। উঠ, তাঁহাকে জাগাও, আর নূতন জাগরণে নবপ্রাণে পূর্ব্বাপেক্ষা মহাগৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে তাঁহার রত্ন-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা কর।" এই নির্দেশ-অনুসারে স্বাধীন ভারতের সকল বিভাগের সংস্কারের আবশ্যকতা প্রচার করিবার জন্য আমরা স্বদেশহিতৈষী শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

জাতীয় জীবনে বেদান্ত-প্রয়োগে

স্বামী বিবেকানন্দ

(১)

কালচক্রের আবর্তে ভারতবর্ষ আজ বহুবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ যোগদৃষ্টি-সহায়ে এই সমস্যাসমূহ দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে, ইহাদের সম্যক্ সমাধানের উপরই ভারতের উন্নতি নির্ভর করে। এই কারণে তিনি এ সম্বন্ধে আলোচনা ,করিবার জন্য দেশের বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের সকল সমস্যা-সমাধানের প্রধান উপায়রূপে বেদান্তকে জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করিতে তাঁহার দেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত বেদান্ত কেবল যুক্তিপূর্ণ

দার্শনিক তত্ত্বমাত্র নয়। ইহা সকল কালের সকল ধর্ম ও সকল নীতির মূল তত্ত্ব। বেদান্ত বলিতে বুঝায়—অনাদি অনন্ত শাশ্বত সার্বভৌম জ্ঞানরাশি। সত্যদর্শী ঋষি-হৃদয়ে এই জ্ঞান প্রথমে প্রতিভাত হয়। বেদান্ত কোন দেবদেবী ধর্মপ্রবর্তক সম্প্রদায় বা ধর্মগ্রন্থের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু সকল ধর্মের সকল দেবদেবী প্রবর্তক সম্প্রদায় ও শাস্ত্রের ইহাতে সম্মানিত স্থান আছে। ইহা দেশ-কাল-পাত্রাতীত নীতিতত্ত্বেরও উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ। দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত দ্বৈতাদ্বৈত অচিন্ত্যভেদাভেদ অদ্বৈত প্রভৃতি দার্শনিক মতবাদ ইহার অন্তর্ভুক্ত। তবে যে বেদান্ত বলিতে সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদই লক্ষ্যীভূত, ইহার কারণ অদ্বৈতবাদী আচার্যগণ শ্রুতি-প্রমাণের উপর যতটা নির্ভর করিয়াছেন, অন্যান্য মতবাদী আচার্যগণ তাহা করেন নাই। তাঁহারা শ্রুতি অপেক্ষা পুরাণ ও অন্যান্য প্রমাণের উপর বেশী জোর দিয়াছেন। কিন্তু সকল মতবাদের আচার্যগণই বেদান্তকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব মতপোষক ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই আচার্যগণের প্রবর্তিত দার্শনিক মতগুলি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হইলেও উহারা প্রকৃত-পক্ষে বিরোধী নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "শ্রুতিবাক্যগুলি অতি মনোরম, অতি অদ্ভুত, আর উহারা পরস্পরবিরোধী নয়, উহাদের মধ্যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান,

একটি তত্ত্ব যেন অপরটির সোপান-স্বরূপ। * * দ্বৈতবাদী থাকিবেই—অদ্বৈতবাদীর ন্যায় দ্বৈতবাদীরও জাতীয় ধর্ম্ম-জীবনে বিশেষ স্থান আছে। একটি ব্যতীত অপরটি থাকিতে পারে না। একটি অপরটির পরিণতি-স্বরূপ; একটি গৃহ, অপরটি ছাদ-স্বরূপ; একটি যেন মূল, অপরটি ফলস্বরূপ।" বেদান্তের ভাবঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন উদ্ধৃত বাক্যের জীবন্ত আদর্শ। স্বামীজির ভাষায়—"তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত উপনিষদের ভাবগুলি যেন মানবরূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।" তিনি যেমন ছিলেন দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, তেমন ছিলেন অচিন্ত্যভেদাভেদ ও অদ্বৈতবাদী; তিনি যেমন ছিলেন ভক্ত ও কর্মী, তেমন ছিলেন যোগী ও জ্ঞানী। এই মহাসমন্বয়াচার্যের সাধনজীবন প্রমাণ দেয় যে, দ্বৈত অদ্বৈত মতগুলি আপন আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও এক আশ্চর্য সামঞ্জস্যে সমন্বিত।

হিন্দুধর্মের অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ই বেদান্তকে দার্শনিক ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। দর্শনই ধর্মমতের প্রাণ। এই দিক দিয়া বেদান্ত হিন্দু-ধর্মসম্প্রদায়মাত্রেরই প্রাণশক্তি। প্রাচীন পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়সমূহ এবং ইহাদের শাখা-প্রশাখা হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগের শৈব বৈষ্ণব শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়—এমন কি আধুনিক যুগের ব্রাহ্মসমাজ আর্যসমাজ প্রভৃতিও বেদান্তের প্রামাণ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার

করেন। এই সকল ধর্মমত যুগে যুগে বেদান্তবেদ্য "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" বাণীকেই বিভিন্নভাবে রূপায়িত করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আমরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলি, এই অনন্ত শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট মহান্ অশ্বত্থ-বৃক্ষস্বরূপ হিন্দুধর্ম্ম বেদান্তের প্রভাবে সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বেদান্তই আমাদের প্রাণ।" কেবল হিন্দুধর্ম নয়; তাঁহার মতে জৈন বৌদ্ধ শিখ প্রমুখ সকল ভারতীয় ধর্মের সারভাগই বেদান্ত হইতে গৃহীত। এই ধর্মত্রয়ের দার্শনিক তত্ত্ব এবং উপাসনা-পদ্ধতি বেদান্তের অনুরূপ। এই জন্য স্বামীজি ভারতীয় ধর্মমাত্রকেই বৈদান্তিক হিন্দুধর্মেরই এক একটি শাখা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বেদান্ত-শব্দে ভারতীয় ধর্ম্মসমষ্টি বুঝিতে হইবে।"

তাঁহার মতে বেদান্ত কেবল ভারতীয় ধর্মমত-সমূহেরই উৎস নয়, অধিকন্তু ইহা ভারতের তীর্থ মন্দির সাধনা উৎসব পূজা পার্বণ ভাষা সাহিত্য চিত্রকলা স্থাপত্য ভাস্কর্য সংগীত প্রভৃতির মূলেও বিদ্যমান থাকিয়া ভারতের গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতিকে স্মরণাতীত কাল হইতে আজও ঐক্যবদ্ধ ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির 'বহুত্বে একত্ব এবং একত্বে বহুত্ব' বেদান্তই সম্ভব করিয়াছে। এই সকল কারণে বেদান্ত-

দর্শন ভারতের জাতীয় জীবন-দর্শন এবং এই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশি-প্রদত্ত 'হিন্দু'নাম অপেক্ষা 'বৈদান্তিক' নামই ভারতীয় ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে সমধিক উপযোগী বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন। বেদান্তকে অবলম্বন করিয়া ভারতীয় ধর্মাবলম্বিগণ এক অচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। সর্বধর্মসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই ঐক্যের জীবন্ত প্রতীক। তিনি নিজ জীবনে কার্যতঃ অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে অব্যাহত রাখিয়াও কেমন ভাবে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে। প্রাচীনকাল হইতে ভারত ধর্মবিরোধ এবং ধর্মজ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত সামাজিক ভেদ-বিরোধের ফলে স্বগৃহে শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া মরণের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয়-সাধন এই সর্বনাশকর গৃহবিরোধ দূর করিয়া ভারতকে ঐক্যবদ্ধ হইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই পথের অনুসরণই ভারতের জাতীয় উন্নতির প্রধান উপায় বলিয়া বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন।

তিনি বেদান্ত-সহায়ে অধঃপতিত ভারতের অভ্যুদয়-সাধনের পন্থাও নির্দেশ করিয়াছেন। বর্তমানে ভারতের জনসাধারণ এক মহা তামসিকতার গভীর নিদ্রায় মগ্ন। শত শত শতাব্দী যাবৎ স্বদেশি-বিদেশীর অত্যাচারে লুপ্ত

হইয়াছে তাহাদের আত্মবিশ্বাস এবং দৈন্যদুঃখের নির্মম পেষণে পঙ্গু হইয়াছে তাহাদের মনুষ্যত্ব। জন্মান্তরবাদের বিকৃত ব্যাখ্যামূলে আজও তাহাদিগকে বলা হইতেছে —তোমরা স্বকৃত কর্মফলে জন্মিয়াছ হীনতার পঙ্কের মধ্যে, সারাজীবন তোমাদের থাকিতে হইবে নৈরাশ্যের অন্ধকারে! আজন্ম এই নিরাশার কথা শুনিয়া, অজ্ঞতার অতলগর্ভে নিমজ্জিত থাকিয়া এবং কল্পনাতীত দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা সহিয়া তাহারা নিজেদের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ক্রমেই ডুবিতেছে—গভীর হইতে গভীরতর অন্ধকারে ডুবিতেছে। তাহাদের পেটে অন্ন নাই, পরনে কাপড় নাই, শিক্ষার আলোক হইতে তাহারা বঞ্চিত। অথচ এই গণবিগ্রহকে লইয়াই দেশ, দেশের সর্ববিধ উন্নতি নির্ভর করে ইহাদের অভ্যুদয়ের উপর। ইহা মনে-প্রাণে বুঝিয়া স্বামী বিবেকানন্দ এই সর্ব্বহারা নরনারীগণের অভ্যুত্থানের উপায়-রূপে তাহাদের অজ্ঞান-অন্ধকারময় পর্ণকুটিরে বেদান্তের জ্ঞানালোক-বর্তিকা—আত্মবিশ্বাসের বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইতে দেশের শিক্ষিত যুবকগণকে বারংবার প্রবুদ্ধ করিয়াছেন। অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিতে বেদান্তের তুল্য কার্যকর আর কিছু নাই। এই যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্র মানুষকে সাহসের সহিত তাহার সকল দোষ নিজের স্কন্ধে লইয়া উহা হইতে

নিষ্কৃতিলাভের উপায় দেখায়। বেদান্ত বলে, মানুষ তাহার কর্মফলে সুখ-দুঃখ ভোগ করে বটে, কিন্তু চেষ্টা করিলে যে-কোন মানুষ আপন কর্মকে ইচ্ছামত পরিচালন করিয়া তাহার সুখ-দুঃখ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করিতেও পারে। কর্মজনিত সুখ-দুঃখ মানুষের নিজেরই সৃষ্ট; কাজেই চেষ্টা করিলে সে এই কর্মজালের বাহিরে যাইতে—এমন কি নিত্যানিত্যবিচারমূলে অনিত্য বিষয় ত্যাগ করিয়া অথবা আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা কর্মবীজ দগ্ধ করিয়া সর্ববন্ধন-বিমুক্তও হইতে পারে। বেদান্ত শিক্ষা দেয় যে, মানবাত্মা অজর অমর, দেহনাশে তাহার নাশ হয় না। যেমন মলিন কাচ সূর্য-কিরণকে মলিন করিতে পারে না, তেমন জাতি-বর্ণ সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যু আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত আত্মা মানুষের সকল জ্ঞান ও শক্তির উৎস। এই উৎস হইতে জ্ঞান ও শক্তি সংগ্রহ করিয়া মানুষ সকল বিষয়ে জ্ঞানবান্ ও শক্তিমান্ হইয়া থাকে। ঐকান্তিক আগ্রহ থাকিলে এবং কৌশল আয়ত্ত করিতে পারিলে আত্মশক্তির উদ্বোধন করিয়া যে-কোন মানুষ—তা সে যতই পতিত নীচ, যতই জ্ঞান ও শক্তিহীন হ'ক না কেন—যে-কোন বিষয়ে উন্নত জ্ঞানবান্ ও শক্তিমান্ হইতে পারে। এই উপায়ে নৈরাশ্য-ব্যথিত হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতে, ভীরুকে সাহসী

এবং দুর্বলকে সবল করিয়া তুলিতে বেদান্তের তুল্য কার্যকর আর কিছু নাই। বেদান্ত ঘোষণা করে যে, মানুষমাত্রই স্বরূপতঃ অব্যক্ত ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মস্বরূপ পরিব্যক্ত করাই মানুষের জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। মানুষ ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিশ্রিত করিয়া আপনার স্বরূপ ভুলিয়া মোহনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে। এইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' মন্ত্রে সকল নরনারীকে জাগাইয়া ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

(২)

স্বামীজি কেবল উল্লিখিত বিষয়ে নয়, পরন্তু বেদান্ত-সহায়ে ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার সমাধান এবং উভয় জাতির সম্মিলনেরও উপায় দেখাইয়াছেন। তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্মরূপ দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইস্‌লামীয় দেহ একমাত্র আশা। * * আমার মাতৃভূমি যেন ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক মস্তিষ্করূপ দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হন।" ইহার অর্থ—বৈদান্তিক যেরূপ জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল

নরনারীকে একই ব্রহ্ম বা আত্মস্বরূপে দেখেন, ইস্‌লাম-পন্থিগণ সমাজের দিক দিয়া তাঁহাদের স্বধর্মাবলম্বিগণকে সেইরূপ ভ্রাতৃভাবে দেখিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে তদনুরূপ ব্যবহার করেন। বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া যে চূড়ান্ত সাম্য মৈত্রী ও সমদর্শন প্রচার করেন, ইস্‌লামপন্থিগণ তাঁহাদের সমাজের দিক দিয়া সেই সকল বিষয়কে অনেকটা কাজে লাগাইয়াছেন। মুসলমানদের এই সামাজিক সাম্যে মুগ্ধ হইয়া স্বামীজি বলিয়াছেন, "মহম্মদ দেখাইয়া গিয়াছেন—মুসলমানদের মধ্যে কোন ভেদ না রাখিয়া ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় সখ্যবদ্ধতা। তুরস্কের সুলতান আফ্রিকার বাজার হইতে এক জন নিগ্রোকে ক্রয় করিলেন, কিন্তু ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করার পর যোগ্যতা, গুণ ও সামর্থ্য থাকিলে সে সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে, আর আমরা হিন্দুরা ?"

হিন্দুরা সমাজের দিক দিয়া বিদেশী বিজাতি বিধর্মী দূরের কথা, অনেক স্বদেশী স্বজাতি স্বধর্মীকেও সর্বপ্রযত্নে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন। সমাজক্ষেত্রে হিন্দুদের মধ্যে এক জাতি অপর জাতিকে নীচ মনে করিয়া অপমানকর ও অসম্মানজনক দৃষ্টিতে দেখেন এবং তদনুরূপ ব্যবহার করেন। ইহার ফলে হিন্দুগণ পরস্পর বিরোধ-বিদ্বেষে জর্জরিত। হিন্দুজাতির এই স্বগৃহবিরোধই যে তাঁহাদের রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক পরাধীনতা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ববিধ দুঃখ দৈন্য ও দুর্দশার মূল কারণ,

ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। এই সামাজিক অনৌদার্যের জন্য সাধারণতঃ অনেক হিন্দু সমাজের দিক দিয়া মুসলমান ও অন্যান্য অহিন্দু জাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না এবং আপন অঙ্কে স্থান দিতে পারেন না। এই অনুদারতা দূর করিয়া হিন্দুজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার উপায়রূপে স্বামীজি ইস্‌লাম-পন্থাদের সামাজিক সাম্য-মৈত্রীর আদর্শে হিন্দুসমাজ পুনর্গঠন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম হ'ক না কেন, কর্ম্মে পরিণত ইস্‌লামের সহায়তাব্যতীত তাহা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণ নিরর্থক।" ইহার অর্থ—বেদান্তের একত্ব অভেদত্ব সাম্য-মৈত্রী মুসলমানগণ তাঁহাদের সমাজক্ষেত্রে যেরূপভাবে কাজে লাগাইয়াছেন, এইরূপভাবে কাজে লাগাইতে না পারিলে বেদান্ত অধিকাংশ লোকের নিকট অর্থহীন শব্দমাত্রেই পর্যবসিত থাকিবে, ইহা কোন কালেও জনসাধারণের উপকারে লাগিবে না। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের সামাজিক সাম্যও তাঁহাদের স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং এই দিক দিয়া ইহাও সংকীর্ণ। বেদান্তের সার্বভৌম সাম্য-মৈত্রীকে সমাজ-জীবনে দৈনন্দিন ব্যবহার-ক্ষেত্রে কাজে লাগাইয়া হিন্দুকে সর্ববিধ সংকীর্ণতার বাহিরে যাইতে হইবে। সমাজের দিক দিয়া হিন্দুগণ যাহাতে সকলকে আপনার করিয়া আপন অঙ্গে অঙ্গীভূত করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইহাই হিন্দুর স্বগৃহে সাম্য এবং বিশ্বমানবের সহিত ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপায়।

এই প্রসঙ্গে ইহাও অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমানগণ তাঁহাদের সমাজের দিক দিয়া যেমন, হিন্দুরা তাঁহাদের ধর্মের দিক দিয়া তেমন উদার। সাধারণতঃ হিন্দুর মস্তিষ্ক বেদান্ত-ভাবে ভাবিত। ধর্মক্ষেত্রে হিন্দুরা বেদান্তের সাম্য-মৈত্রী ও সমদর্শন অনেকটা কাজে লাগাইয়াছেন। ধর্মের দিক দিয়া অধিকাংশ হিন্দু পৃথিবীর সকল নরনারীকে একই ব্রহ্ম বা আত্মার বিভিন্ন রূপাভিব্যক্তি বলিয়া মনে করেন, জগতের সকল ধর্ম এবং উহাদের প্রবর্তকগণের প্রতি সম্মান দেখান, তথাকথিত নীচজাতীয় ধর্মাচার্যদের মূর্তি স্থাপন করিয়া মন্দিরে পূজা দেন, মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতিকে যথার্থই শ্রদ্ধা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের এই অসাধারণ পরধর্ম-সহিষ্ণুতা গণতান্ত্রিকতা সাম্য-মৈত্রী সমদর্শন ও ঔদার্যের যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, ধর্মক্ষেত্রে অধিকাংশ মুসলমানের পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা একতান্ত্রিকতা পরধর্মবিদ্বেষ ও অনৌদার্যের সেইরূপ নিন্দা করিয়াছেন। আমেরিকায় একটি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "তাহাদের (এক শ্রেণীর মুসলমানদের) মূলমন্ত্র হইতেছে—ঈশ্বর এক এবং মহম্মদই তাঁহার দূত; এইজন্য বাহিরের যাহা কিছু তাহা যে কেবল মন্দ তাহা নহে, তাহাকে ধ্বংস করা চাই-ই তৎক্ষণাৎ!

এ বিশ্বাস যাহার নাই, তাহাকে হত্যা কর ; ইহা ভিন্ন অন্য প্রকারের পূজা যাহারা করে, তাহাদের সে পূজা নাশ কর ; এতদ্ব্যতীত অন্যকথা যে পুস্তকে আছে, তাহা দগ্ধ কর !" সাধারণতঃ মুসলমানেরা তাঁহাদের ধর্মের দিক দিয়া হিন্দু খৃষ্টান ও অন্যান্য অ-মুসলমানকে অত্যন্ত হীন দৃষ্টিতে দেখেন। বলা বাহুল্য যে, ধর্ম-সম্বন্ধে মুসলমানদের এই অসহিষ্ণুতা ও অনৌদার্য হজরত মহম্মদের উপদেশ-বিরোধী। এই মহাপুরুষের জীবনে পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কোরানেও সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার উপদেশ আছে। হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলমান জাতির সঙ্গে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে মুসলমানদিগকে পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা ও অনুদারতা পরিহার করিয়া বৈদান্তিকের ন্যায় সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতেই হইবে। যে পর্যন্ত ইহা সম্ভব না হইতেছে, সে পর্যন্ত হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলমান ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের প্রকৃত ঐক্য-প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব হইবে না, ইহা নিশ্চিত।

ভারতে প্রচলিত ইসলামধর্ম সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে হিন্দুধর্ম তথা বেদান্তদ্বারা প্রভাবিত হইয়া অনেকটা পরধর্ম-সহিষ্ণু ও উদার হইয়াছে। এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "বেদান্তধর্মের উদার ভাব ইসলামকে অনেক প্রভাবান্বিত করিয়াছে। অন্যান্য দেশের মুসলমান ও ভারতের

মুসলমান স্বতন্ত্র।” বর্তমান কালে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সুফী অর্হর বাহাই আমেদিয়া সইবাবা খোজা দরবেশ প্রভৃতি নব্য সম্প্রদায় বেদান্ত দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত। চেষ্টা করিয়াও এই প্রভাব অতিক্রম করা ভারতের ইসলামপন্থীদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আধুনিক ভারতে প্রচলিত ইসলামধর্ম এই সকল সম্প্রদায়ের সমষ্টি। পক্ষান্তরে, বর্তমান ভারতে প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও সমাজ ইসলামের প্রভাবে সমভাবেই প্রভাবান্বিত হইয়াছে। মুসলমানদের ভারতে আগমনের পর হইতে রামানন্দ কবীর দাদূ নানক সুরদাস চৈতন্য প্রমুখ মধ্য-যুগের ধর্মপ্রবর্তকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের রামমোহন কেশবচন্দ্র দয়ানন্দ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও অন্যান্য অভিনব ধর্মপ্রবর্তকগণের মতবাদের উপর ইসলামের প্রভাব যথেষ্ট। মুসলমানদের ভারতে আগমনের পর মুসলমান ও হিন্দু উভয় জাতির মধ্যে যে-সকল ধর্মপ্রবর্তক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই কমবেশী হিন্দু-মুসলমান-ধর্মের মিলনের গানই গাহিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভারতে নব্য মুসলমানসম্প্রদায়-প্রবর্তকদের মধ্যে কেহ মুসলমানকে নিছক আরবীয় ভাবাপন্ন করিতে এবং কোন নব্য হিন্দুধর্মাচার্য হিন্দুকে প্রাচীন বৈদিক যুগে পুনরায় লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান ভারতের হিন্দু ও ইসলামধর্ম উভয়ই যে পারস্পরিক আদানপ্রদান-

সমুদ্ভূত, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। কেবল ধর্মের দিক দিয়া নয়, আধুনিক ভারতের কৃষি শিল্প বাণিজ্য সাহিত্য ভাষা ভাস্কর্য স্থাপত্য চিত্রকলা সংগীত প্রভৃতি ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমান গঙ্গা-যমুনার মত মিলিত হইয়া সাগর-সঙ্গমে চলিয়াছে। বর্তমান ভারতের এই সকল সাংস্কৃতিক বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই দান আছে। ভারতের মাটির গুণে হিন্দু-মুসলমান কাল্‌চার সমন্বিত হইয়া ভারতীয় কালচার বা সংস্কৃতিরূপে আপন বৈশিষ্ট্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ এই সমন্বিত সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক। হিন্দু ও মুসলমান স্ব স্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও কেমনভাবে মিলিত হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করাই এ যুগে তাঁহার আবির্ভাবের অন্যতম কারণ। ভারতের সমষ্টি-জীবনে এই আদর্শকে রূপায়িত করাই হিন্দু-মুসলমান-সম্মিলনে একজাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় বলিয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন।

(৩)

স্বামীজি সার্বভৌম বেদান্ত-সহায়ে কেবল হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার উপায় দেখাইয়াই কর্তব্য শেষ করেন নাই, পরন্তু তিনি এই মহৎ দর্শনবেদ্য চরম সাম্য জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার উপায়রূপে আধুনিক বিজ্ঞান-

সম্মত সমাজতান্ত্রিক সাম্যনীতি গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, বর্তমানে রাষ্ট্রে সমাজে ধর্মে বিশ্বময় মানুষে মানুষে সকল বিষয়ে সমানাধিকার ও সাম্যমৈত্রী-প্রতিষ্ঠার জন্য বহুবিধ মতবাদের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইতেছে। এই সকলের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের সাম্য সকল দেশের জন-সাধারণকে ক্রমেই অধিকমাত্রায় প্রভাবিত করিতেছে। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদিগণ সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, দেশের জনগণের জীবন-যাত্রা-নির্বাহের পক্ষে অপরিহার্য খাদ্য ও বস্ত্রাদির উৎপাদন ও বিতরণ-ব্যবস্থা সাম্য-ভিত্তিতে গঠিত এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণীনির্বিশেষে সকল নরনারীর সকল বিষয়ে সমান অধিকার-নীতিমূলে পরিচালিত হইলে জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে সাম্য প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার ফলে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন বহুলাংশে সাম্য-মৈত্রীপূর্ণ হইতে পারে। এই বিজ্ঞানসম্মত অর্থনীতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা-সম্বন্ধে সাম্যপ্রতিষ্ঠাকামী সত্যসন্ধ সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এখন আর কোন মতভেদ দেখা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বহুকাল পূর্বে এই সমাজ-তান্ত্রিক সাম্যের কার্যকর প্রণালী-অবলম্বনে বেদান্তের চূড়ান্ত সাম্যকে সকল নরনারীর কর্মজীবনে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন, "আমি সমাজতন্ত্রবাদী।" তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে বহু বাক্য উদ্ধৃত

করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, তিনি যথার্থ সমাজতন্ত্রবাদীর ন্যায় দেশের সকল সম্পদে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নরনারীর সমান-অধিকার সকল বিষয়ে এবং উন্নতিলাভের সমান সুযোগ অত্যন্ত জোরের সহিত সমর্থন করিয়াছেন। দেশের দরিদ্র জনগণের উপর মুষ্টিমেয় ধনিকের প্রাধান্য, অবনত অনুন্নত নিম্নশ্রেণীর উপর উচ্চশ্রেণীর প্রভুত্ব, সমষ্টির উপর ব্যষ্টির কর্তৃত্ব তিনি একেবারেই সমর্থন করেন নাই। তিনি পাহাড় পর্বত অরণ্য হাট বাজার ও দরিদ্রের পর্ণকুটির হইতে নূতন ভারতের অভ্যুদয় কামনা করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে যে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচলিত ছিল, উহা অপেক্ষাও উন্নত ধরনের সাম্যের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। এ সম্বন্ধে একখানা পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, "আমি যে একজন সমাজতন্ত্রবাদী (Socialist), তার কারণ এ নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি, 'কেবল নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল'—এই হিসেবে।" স্বামীজি সমাজতন্ত্রবাদের সকল শাখা এবং সম্ভবতঃ কার্ল মার্কসের অত্যুগ্র বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রবাদ তথা সাম্যবাদের সহিতও পরিচিত ছিলেন। এই মনীষীর প্রবর্তিত সাম্যবাদ (Communism) সমাজতন্ত্রবাদেরই একটি শাখা। ইহা অত্যুগ্র শ্রমিকবিপ্লববাদ। এই মতবাদিগণ সংঘবদ্ধ শ্রমিকবিদ্রোহ-সহায়ে বলপূর্বক ধনিক ও অভিজাত শ্রেণীকে একেবারে উচ্ছেদ করিয়া সার্বভৌম শ্রমিক

রাষ্ট্র (Dictatorship of Proletariat) প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর। এই গণতন্ত্রবিরোধী মতবাদিগণ প্রচলিত আইন শৃঙ্খলা ও ন্যায়-নীতি মানেন না বলিয়া কোন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং শান্তিকামী ব্যক্তি ইঁহাদের ধ্বংসাত্মক কার্য-প্রণালী সমর্থন করিতে পারেন না। এই দলের প্রচারিত নিছক জড়-বাদদ্বারা সকল শ্রেণীর আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদিগণ কম বেশী প্রভাবিত বলিয়া অনুমিত। ইঁহারা সকলেই কেবল অর্থনীতিক সাম্য বা সকল নরনারীর ভোগসাম্য সাধনের উপরই সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। তবে এই সাম্যের পরিমাণ এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রণালী সম্বন্ধে ইঁহাদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন মত প্রচার করিয়া থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দ কেবল অর্থনীতি ক্ষেত্রে নয়, পরন্তু মানব-জীবনের সকল বিভাগ—এমন কি ব্যক্তিমাত্রেরই দৈনন্দিন কর্মজীবনও বৈদান্তিক সাম্যের নির্দেশে পরিচালন করিবার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক সাম্য প্রধানতঃ জড়বাদমূলক এবং ইহার দার্শ-নিকতাও যুক্তিবিচারসহ নহে। এই সকল কারণে তিনি প্রধানতঃ অর্থনীতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রবাদ সর্বাংশে সমর্থন করিতে পারেন নাই।

ইহাও সত্য যে, সাধারণতঃ সমাজতান্ত্রিকগণ তাঁহাদের মতবাদকে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদের

মধ্যে অনেকে সেই প্রাচীন কালের 'হিতবাদ' (Utilitarianism)—'অধিকাংশ নরনারীর অধিকতম হিতসাধন'-নীতি তাঁহাদের মতের দার্শনিকতা বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু সকল শ্রেণীর সমাজতন্ত্রবাদই মুখ্যতঃ ভোগের উৎকর্ষসাধনলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত এবং সকল নরনারীর ভোগসাম্য এই মতবাদীদের প্রধান কাম্য। এই কারণে বিশ্বময় অধিকাংশ প্রবৃত্তিপন্থী ভোগসর্বস্ব নরনারীর পক্ষে স্ব স্ব ভোগস্বার্থ সংকোচ বা ত্যাগ করিয়া কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণা ভিন্ন 'বহুজনহিতায়' যথার্থ 'হিতবাদী' হওয়া কার্যতঃ সম্ভব নহে। নিছক ভোগ-লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত কোন মতবাদ মানুষকে প্রকৃত আত্মত্যাগে বা পরার্থপরতায় উদ্বুদ্ধ করিতে অক্ষম। দেখা যায়—খৃষ্টান সমাজতন্ত্রবাদিগণ যীশুখৃষ্টের সাম্য-মৈত্রীমূলক উপদেশসমূহকে তাঁহাদের মতবাদের দার্শনিক ভিত্তি বলিয়া প্রচার করিলেও এই মতবাদ খৃষ্টানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলিয়া ইহাকে কার্যে পরিণত করা কোন দেশে এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। এজন্য এই মত অন্যান্য সমাজতন্ত্রবাদীদের দৃষ্টিতে কাল্পনিক (Utopian)। সমাজতন্ত্রবাদিগণের মধ্যে কার্ল মার্কস্ তৎপ্রচারিত সাম্যবাদকে নিছক জড়বাদমূলক এক অদ্ভুত দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার দার্শনিক মতবাদের সারমর্ম অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল:

মার্কস্ তাঁহার প্রসিদ্ধ 'ক্যাপিট্যাল্' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "পদার্থ চৈতন্যশক্তির সৃষ্ট নহে, পরন্তু চৈতন্যশক্তি পদার্থের সর্বোচ্চ সৃষ্টি। জীব বা প্রাণীও একপ্রকার জড়পদার্থ-বিশেষ। জীবন (life) জড়পদার্থের নিত্যগতি (eternal movement of matter)-সমুদ্রের একটি তরঙ্গমাত্র।" দার্শনিক হেগেল 'ডায়ালেক্‌টিক্' নীতি প্রবর্তন করিয়া মনের গতিকে (movement of mind) ইহার ভিত্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। এই মতের অনুসরণ করিয়াও মার্কস্ পদার্থের গতিকে তাঁহার বহু-বিজ্ঞাপিত 'ডায়ালেক্‌টিক্' নীতির ভিত্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, পদার্থের পরিমাণগত (quantitative) ও গুণগত (qualitative) নিয়ত পরিবর্তনের (constant change) সঙ্গে সঙ্গে উহার অবিচ্ছিন্নত্বও (continuity) সর্বদা ভঙ্গ হইতেছে; উহা এক মুহূর্তে যাহা, পরমুহূর্তে তাহা থাকিতেছে না। তাঁহার মতে এই রূপান্তর বা পরিবর্তন (change) আকস্মিক (sudden) ভাবে সংসাধিত হইতেছে। মার্কস্ বলেন, জাতির ইতিহাস সমাজ ধর্ম সংস্কৃতি শিল্প রীতি নীতি প্রভৃতির পরিবর্তন কোন ভাব বা আদর্শ দ্বারা হয় না, পরন্তু ঐ সকল বিষয়ক পরিবর্তন—এমন কি মানুষের সকল ভাব বা আদর্শ পর্যন্ত আর্থিক অবস্থা বা অর্থনীতির প্রভাবে উদ্ভূত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া

থাকে। ইহাই জড়বাদী মার্কসের বহু-প্রশংসিত ইতিহাস ও সমাজবিবর্তনের জড়বাদমূলক ব্যাখ্যা (Materialistic interpretation of the evolution of history and society)। তিনি লিখিয়াছেন, ধনিক (capitalist) ও বুদ্ধিমান্ অভিজাত সম্প্রদায় (bourgeoisie) অজ্ঞ জনসাধারণকে বশীভূত রাখিয়া তাহাদিগের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের উপর কাল্পনিক ধর্ম ও নীতিজ্ঞান চাপাইয়া দিয়াছেন। অসহায় অজ্ঞ দরিদ্র জনগণ, বুর্জুয়া'দের সৃষ্ট পুরোহিতশ্রেণীর উপদেশে 'ধর্মরূপ আফিম' সেবন করিয়া ঝিমাইতেছে! তিনি বলেন, কোন ভাব বা কল্পনা মানুষকে পরিচালন করে না, পরন্তু প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক ও শারীরিক প্রয়োজন—বিশেষ করিয়া অর্থনীতি মানুষের সকল ভাব বা কল্পনাকে পরিচালন করে। মোটের উপর তাঁহার মতে মানুষমাত্রই অর্থনীতি বা আর্থিক অবস্থাসৃষ্ট একটি জটিল জড়যন্ত্রবিশেষ! সংক্ষেপতঃ ইহাই জড়বাদী মার্কসের দার্শনিক অভিমত।

এই মতবাদ আধুনিক বিজ্ঞান যুক্তি বিচার এবং সকল ধর্ম ও নীতি বিরুদ্ধ। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ চৈতন্যশক্তি ও পদার্থ সম্বন্ধে মার্কসের সম্পূর্ণ বিপরীত মত অর্থাৎ চৈতন্যশক্তি হইতে সকল পদার্থ সৃষ্ট এবং পদার্থমাত্রই চৈতন্যশক্তির ঘনীভূত রূপ (bottled-up energy) বলিয়া সন্দেহাতীত-

ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। চৈতন্যশক্তি জড়ের ক্রিয়ামাত্র হইলে প্রাণীর বিচারশক্তি, বুদ্ধির বিকাশ, কর্মে স্বাধীনতা, জ্ঞান ইচ্ছা বিবেক কল্পনা স্মৃতি প্রভৃতি সম্ভব হইত না। কারণ, কোন জড়পদার্থে এইগুলির অভিব্যক্তি নাই। তিনি যে জীবনকে জড়পদার্থের নিত্যগতি বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাও একেবারেই অযৌক্তিক। কেন না, পদার্থের উপাদান পরমাণুর রূপ ও গুণ আছে বলিয়া ইহা স্থূল ও অনিত্য, এজন্য ইহার গতি নিত্য হইতে পারে না। পরমাণু অচেতন ও জড় বিধায় ইহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বুদ্ধি-পূর্বক কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্ম করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। কাজেই পরমাণুর গতির নিয়ামকরূপে কোন বুদ্ধিবিশিষ্ট চৈতন্যশক্তির অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। এই কারণে পদার্থের গতিভিত্তির উপর তিনি যে 'ড়ায়ালেকৃটিক্' নামধেয় এক অদ্ভুত নীতি প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাও সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ। মার্কস্ সর্বজনস্বীকৃত ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচ-নীতি একেবারে অস্বীকার করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত সকল পরিবর্তনকে (change) আকস্মিক এবং ইহাতে প্রাণী ও পদার্থমাত্রেরই অবিচ্ছিন্নতা (continuity) সর্বদা ভঙ্গ হইতেছে, কাজেই উহা পূর্বক্ষণে যাহা পরক্ষণে তাহা থাকিতেছে না বলিয়া যে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, উহাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ, পৃথিবীর সকল জীব ও

পদার্থের ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচ-নীতির অভিব্যক্তি দেখা যায়। অভাব-পদার্থ হইতে কোন ভাব-পদার্থের উদ্ভব হইতে দেখা যায় না। বেদান্তদর্শন-মতে "নাশঃ কারণলয়ঃ।" এইজন্য নাশ পদার্থের ক্রমসংকুচিত সূক্ষ্ম বা কারণ-অবস্থা, ইহার ক্রমবিকশিত স্থূলাবস্থাই কার্য। বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে বীজ জন্মে। যাহাতে যে কারণ নাই, তাহাতে সে কার্য হইতে দেখা যায় না। বেদান্ত বলে, সৃষ্টি অনাদি বলিয়া এই কার্য-কারণ-সম্বন্ধও অনাদি। আকস্মিক পরিবর্তন এবং পরিবর্তনে অবিচ্ছিন্নত্ব-ভঙ্গ স্বীকার করিলে প্রাণী ও পদার্থের কার্য-কারণ-সম্বন্ধ থাকে না। ইহাতে পূর্বক্ষণ (পূর্ববস্তু) অভাবগ্রস্ত হয়, এজন্য ইহা উত্তরক্ষণের (পরবস্তুর) কারণ হইতে পারে না। কাজেই শূন্য হইতে বস্তুর উদ্ভব—অভাব-পদার্থ হইতে ভাব-পদার্থের জন্ম স্বীকার করিতে হয়। ইহা একেবারে প্রমাণ-বিরুদ্ধ। মার্কস্ জলস্রোতের দৃষ্টান্ত দিয়া পূর্বক্ষণের জলকে যে পরক্ষণের জল হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাও যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, পূর্ব-প্রবাহই পরবর্তী প্রবাহ জন্মায়, উভয় প্রবাহের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিলে প্রবাহই থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে, প্রবাহের কারণ উহার অবিচ্ছিন্ন উৎস। বিশ্বময় প্রবাহ-আকারে নিত্য জন্ম-মৃত্যুর স্রোত বহিতেছে; মার্কস্ ইহা দেখিয়াও দেখেন নাই।

বিজ্ঞানসম্মত অর্থনীতি যুক্তি বিচার ও ন্যায়-সঙ্গত হইলেও ইহার জড়বাদমূলক দার্শনিক ব্যাখ্যা একেবারেই অযৌক্তিক বলিয়া ইহা সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী ব্যক্তিদের গ্রহণীয় হইতে পারে না। কেবল সাম্যবাদ নয়, অধিকন্তু সমাজতান্ত্রিক কোন মতেরই দার্শনিক ভিত্তি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিক সাম্য ক্রমেই সকল দেশে অধিকমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করিতেছে, ইহার একমাত্র কারণ—ইহা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী-নির্বিশেষে সকল নরনারীর মধ্যে সকল বিষয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার অত্যন্ত অনুকূল। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে, সকল দেশেরই সাধারণ নরনারী সকল বিষয়েরই দার্শনিকতা-সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তাহারা খাওয়া-পরা অর্থাৎ অর্থনীতিকেই প্রধান মনে করে এবং এই সমস্যার সমাধানই তাহাদের প্রধান কাম্য। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদের দার্শনিক ভিত্তি যুক্তিবিচারসহ এবং দৃঢ় না হইলেও ইহার সাম্যমূলক অর্থনীতি অতি সহজে দরিদ্র জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এইজন্য ইহা ক্রমেই অধিকমাত্রায় সকল দেশে বিস্তার লাভ করিতেছে। আমাদের মতে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বিজ্ঞানসম্মত অর্থনীতিক সাম্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া এই মতবাদকে একটি যুক্তিযুক্ত দার্শনিক

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে ইহা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ এবং যুক্তিবাদী সত্যসন্ধ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও গ্রহণীয় হইবে।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মতে একমাত্র বেদান্তই সমাজতন্ত্রবাদের যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি হইবার উপযুক্ত। তিনি লিখিয়াছেন, "মানব-সমাজের উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ, অন্ততঃ তাঁহাদের পরিচালকগণ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তাঁহাদের ধনসাম্যাত্মক (communistic) ও সমানাধিকার-মূলক মতবাদসমূহের একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকা সঙ্গত এবং একমাত্র বেদান্তই এই ভিত্তি হইবার যোগ্য।" কারণ, দর্শনশিরোমণি বেদান্তে যে সাম্য স্বতঃ পরিস্ফুট, উহা অপেক্ষা উন্নত সাম্য মানুষ কল্পনায় স্থান দিতেও যথার্থই অসমর্থ। স্বামীজি এই চরম সাম্যনীতি সকল ক্ষেত্রে কর্মজীবনে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কি সামাজিক, কি রাজনীতিক, কি আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ মঙ্গল-স্থাপনের একটিমাত্র সূত্র বিদ্যমান—সে সূত্র হইতেছে এইটুকু জানা যে, 'আমি ও আমার ভাই এক'। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বজাতির পক্ষে এই সত্য সমভাবে প্রযোজ্য।"

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, (জড়বাদমূলক সমাজতন্ত্রবাদ মানুষকে অর্থনীতিক অবস্থার সৃষ্ট চৈতন্যশক্তিবিশিষ্ট এক-প্রকার জড়জীব-বিশেষরূপে দেখিতে শিক্ষা দেয়। এইজন্য সমাজতন্ত্রবাদিগণ মানুষকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন

না বলিয়া বর্তমানে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসারসত্ত্বেও জাতির প্রতি জাতির—ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির অপমান ও অসম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহারে কোন পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না—মানুষের প্রতি মানুষের আচরণে শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতেছে না। এক জড়পদার্থ অপর জড়পদার্থের প্রতি কখনও শ্রদ্ধা দেখায় না—দেখাইতে পারেও না। অপর দিকে বেদান্তের জীব-ব্রহ্মবাদে তথা নর-নারায়ণবাদে মানুষের প্রতি মানুষের আন্তরিক সম্মান স্বতঃই পরিব্যক্ত। এই মহৎ শাস্ত্রমতে আত্মারূপী মানুষকে সম্মান আর নারায়ণকে সম্মান—অপর মানুষকে সম্মান আর আপনাকে সম্মান একই কথা।

স্বামী বিবেকানন্দ এই বৈদান্তিক সাম্যকে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া কেবল অর্থনীতি-বিভাগে নয়, পরন্তু মানব-জীবনের সকল বিভাগে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যদি সাংসারিক ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে বেদান্তকে কার্য্যে পরিণত কর, টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্বৈতবাদ সেইদিকে প্রয়োগ কর, তুমি মহামনীষী হইবে। যদি তুমি মুক্তিলাভ করিতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিলে তুমি ঈশ্বর হইয়া যাইবে—পরমানন্দস্বরূপ নির্ব্বাণ লাভ করিবে। এইটুকু ভুল হইয়াছিল

যে, এতদিন উহা কেবল আধ্যাত্মিক দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছিল —এই পর্য্যন্ত। এখন কর্ম্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আর উহাকে রহস্য রাখিলে চলিবে না। এখন আর কেবল হিমালয়ের গুহায় বন-জঙ্গলে সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট উহা থাকিবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। রাজার প্রাসাদে, সাধু-সন্ন্যাসীর গুহায়, দরিদ্রের কুটিরে, সর্ব্বত্র—এমন কি, রাস্তার ভিখারী দ্বারাও উহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। * * তোমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশ—উচ্চদেশ হইতে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হইয়া আসিয়া সমগ্র জগৎকে আচ্ছন্ন করুক, সমাজের প্রত্যেক স্তরে প্রবেশ করুক, প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি হউক, আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হউক, আমাদের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রত্যেক শোণিতবিন্দুর সহিত প্রবাহিত হউক।”

কর্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগে মানুষের পশুত্ব অন্তর্হিত হইয়া দেবত্ব ফুটিয়া উঠিবে—অফুরন্ত শক্তি ও অনন্ত বীর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইবে। ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের প্রয়োগে দুর্বল হৃদয়ে নববল, হতাশ মনে উদ্যম ও নিরাশ অন্তরে আশার সঞ্চার হইবে এবং আত্মবিশ্বাসহীনের জীবন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হইয়া উঠিবে। দৈনন্দিন জীবনে অদ্বৈত-বোধ মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন

আনিবে। কর্মে পরিণত অদ্বৈত ধর্ম-সমা-জাজতিবিরোধরূপ বিষ-বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া সকল নরনারীকে এক অপূর্ব মিলনসূত্রে আবদ্ধ করিবে। ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের প্রয়োগে ধর্মমতসমূহে সমন্বয় এবং সমাজে মানুষে মানুষে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইবে। বেদান্ত-ভাবাশ্রিত একত্ব ও অভেদত্ব-নীতি রাষ্ট্র ও অর্থনীতি-ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইয়া দেশের সকল ধনসম্পদে সকল নরনারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে। জাতীয় জীবনে নরনারায়ণ-ভাবানুপ্রাণিত বেদান্তের প্রয়োগে পৃথিবীর সকল জাতির সকল ধর্মের ও সকল সমাজের সকল মানব যথার্থ বিশ্বভ্রাতৃ-প্রেমে আবদ্ধ হইবে। ব্রহ্মভাবাশ্রিত বেদান্তের অনুসরণ মানুষকে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির পদবীতে উন্নীত করিবে।

———

শূদ্রযুগের অভ্যুদয়ে
স্বামী বিবেকানন্দ

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।" বিশ্বময় বৈশ্য-প্রভুত্বের পূর্ণ প্লাবনের সময়ে স্বামীজি এই সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "প্রথম তিনটির পালা শেষ হইয়াছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে—উহা কেউ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।" তাঁহার এই ভবিষ্যৎ বাণী বর্তমানে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে, কেবল ভারতবর্ষে নয়, পরন্তু পৃথিবীর সকল দেশেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-প্রতিপত্তির যুগ বহুকাল পূর্বেই অতীতের ইতিহাসে পর্যবসিত

হইয়াছে, বৈশ্য-প্রভুত্বের যুগও সকলের চক্ষের সম্মুখে দ্রুত গতিতে অন্তর্হিত হইতেছে এবং শূদ্র-প্রাধান্যের যুগ ক্রমেই ব্যাপকভাবে উহার স্থান অধিকার করিতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির উত্থান ও পতনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিদ্যা ধর্ম ত্যাগ সংযম পরার্থপরতা প্রমুখ অসাধারণ গুণরাশির জন্য ব্রাহ্মণজাতি প্রাচীনকালে সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই মহৎ গুণ-গুলিতে এত উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন যে, আজ পর্যন্তও পৃথিবীর কোন জাতি এই সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদেরই অবদান।

পরবর্তী কালে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ এই গুণাবলী-বিবর্জিত হইয়াও তাঁহাদের জাতিগত প্রাধান্য রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতির উপর ক্রমেই অধিকতর বিধিনিষেধের বোঝা চাপাইতে থাকেন। ক্ষত্রিয়গণ পুরোহিত-ব্রাহ্মণদের ক্রমবর্ধমান জাঁকজমকপূর্ণ মন্ত্রবহুল ক্রিয়াকর্ম ও যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রথমে দণ্ডায়মান হন। এক শ্রেণীর ক্ষত্রিয়েরা অনেক বিষয়ে ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা উদার ছিলেন। এসম্বন্ধে স্বামীজি একখানা পত্রে লিখিয়াছেন, "যখনই ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্ম উপদেশ দিয়েছেন,

তাঁরা জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সব্বাইকে অধিকার দিয়েছেন। * * গীতায় সকল নরনারী, সকল জাতি, সকল বর্ণের জন্য পথ উন্মুক্ত রয়েছে, আর ব্যাস গরিব শূদ্রদের বঞ্চিত করবার জন্য বেদের স্বকপোলকল্পিত মানে করেছেন!" যাহা হ'ক, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-সংঘর্ষের শেষাবস্থায় ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য-বলের উপর ক্ষত্রিয়দের বাহুবল প্রাধান্য লাভ করে। ক্রমে অধিকাংশ গুণহীন ব্রাহ্মণ-পুরোহিত প্রভাবশালী ক্ষত্রিয়-রাজাদের স্তাবকে পরিণত হন। ক্ষত্রিয়-রাজগণের মধ্যে অনেকে ধর্মপ্রাণ ও প্রজারঞ্জক এবং অধিকাংশই উচ্ছৃঙ্খল ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। শেষোক্ত শ্রেণী ভোগবিলাসের জন্য বিত্তশালী বৈশ্যগণকে শোষণ করিয়া তাহাদের সম্পদ্ সংগ্রহ করিতেন। এজন্য দেশের ধনধান্যের অধিপতি বৈশ্যগণ অর্থবলে ক্ষত্রিয় রাজশক্তিকে করায়ত্ত করিতে সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু ভারতীয় বৈশ্যজাতি সংঘবদ্ধ ছিল না বলিয়া তাঁহাদের এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের বৈশ্যগণ সংঘবদ্ধ হইয়া অর্থবলে তথাকার রাজশক্তিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতীয় বৈশ্যদের মধ্যে অনেকে ধর্ম সংস্কৃতি প্রভৃতির প্রতি অনুরক্ত এবং দানশীল ছিলেন। তাঁহাদের অর্থ-সাহায্যেই ভারতে ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি ও

শিল্পাদি পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। সকল দেশেই বৈশ্যগণ রাজশক্তি-সাহায্যে ধন-সম্পদ্ সংগ্রহ করিতেন এবং এখনও করেন সুকৌশলে মক্ষিকারূপ অগণন শূদ্র-জনসাধারণের বহু কষ্টে তিলে তিলে সঞ্চিত মধুচক্র হইতে!

স্বামী বিবেকানন্দের মতে সংখ্যাবহুল শূদ্রদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব, ক্ষত্রিয়ের শক্তি এবং বৈশ্যের ধন-ধান্য সম্ভব হইলেও তাঁহারা (দেশের আপামর শূদ্রজনগণ) 'চলমান শ্মশান' 'ভারবাহী পশু' নামে অভিহিত হইয়া বরাবর উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন। সংহিতা-পুরাণাদি-পাঠে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রগণকে বিদ্যার্জন ধর্মসাধন সংস্কৃতিলাভে —এমন কি কোন সম্মানজনক বৃত্তি-অবলম্বনে জীবিকা-নির্বাহ করিবার অধিকার হইতেও বরাবর বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তাঁহাদের স্বার্থ-সাধনের জন্য ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় এই অত্যাচার সমর্থন করিয়াছিলেন। শেষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি মিলিয়া শত বিধি ও সহস্র নিষেধের পাষাণচাপে অসহায় শূদ্রগণকে বহুকাল পিষ্ট করিয়াছেন! সম্মুখে নির্মলসলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা সত্ত্বেও পয়ঃ-প্রণালীর জলপান করিতে এই পশুপ্রায় শূদ্র নরনারী-কুলকে বাধ্য করা হইয়াছে! তাঁহাদের বিদ্যালাভ ও

ধর্ম-সাধনের চেষ্টারূপ গুরুতর অপরাধের জন্য তাহাদিগকে 'জিহ্বাচ্ছেদ' 'শরীরভেদ' প্রভৃতি দণ্ড প্রদান করা হইত! বিদ্যার্জন ও সম্মানজনক বৃত্তি-অবলম্বনে জীবিকা-নির্বাহ হইতে তাঁহাদিগকে রাজসহায়ে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। ভারতের ইতিহাস সন্তোষজনক প্রমাণ দেয় যে, এই ভাবে ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ দেশের শক্ত্যাধার শূদ্রজনসাধারণ হইতে আপনাদিগকে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই কালক্রমে তাঁহারা সকলেই অধঃপতিত হন এবং তাঁহাদের প্রভুত্ব চিরতরে নষ্ট হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখিয়াছেন:

"মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে থেকে তবু কোলে দেও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান!"

স্বামী বিবেকানন্দ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ কর্তৃক শূদ্রাদি নিম্নবর্ণের প্রতি উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যেমন তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন, শূদ্রজাতির দোষগুলিরও তেমন নিন্দা করিতে দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার মতে প্রাচীন ভারতে শূদ্রজাতির উন্নতির আগ্রহ ছিল না, জ্ঞানের তৃষ্ণা ছিল না, মনের বল ছিল না, দাসত্বে অরুচি ছিল না, অপমান ও অসম্মানে বেদনা-বোধ ছিল না, ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি প্রভৃতির প্রতি তেমন শ্রদ্ধা ছিল

না। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ হিংসা অত্যন্ত প্রবল ছিল। এখনও ব্রাহ্মণাদি অপেক্ষা শূদ্রাদি নিম্নবর্ণগুলির পরস্পরের মধ্যে অনাচরণীয়তা ও অস্পৃশ্যতা অত্যন্ত প্রবল—জঘন্য। এই সকল 'নৈসর্গিক' কারণে শূদ্রজাতি এত দিন পরাধীন ছিল।

বিদেশী ইংরেজের অধিকারে সর্বপ্রথমে ধর্ম-জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে ভারতের সকল নরনারীর সকল বিষয়ে সমান অধিকার এবং উন্নতি-লাভের সমান সুযোগ উপস্থিত হয়। এক শ্রেণীর শূদ্রগণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা লাভ করিয়া সকল বিষয়ে আপনাদের জন্মগত ন্যায্য অধিকার ক্রমেই অধিকতর সংঘবদ্ধভাবে দাবী করিতে থাকেন। ইহার ফলে শূদ্রজাতির মধ্যে জাগরণ আরম্ভ হয়। বিশ্বময় সকল বিষয়ে সকল মানুষের সমানাধিকারমূলক গণতন্ত্রের প্রসার, স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক বেদান্তের একত্ব অভেদত্ব সাম্য মৈত্রী সমদর্শন ও নরনারায়ণ-সেবা-মাহাত্ম্য-প্রচার এবং বহু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইহার অনুসরণ, কংগ্রেসের স্বাধীনতা-আন্দোলন, ট্রেড্ ইউনিয়নসমূহের শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক-প্রজা-আন্দোলন, অবনত ও অনুন্নত জাতিসমূহের উন্নয়ন এবং অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ-আন্দোলন, সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের প্রসার প্রভৃতি শূদ্রযুগ-আনয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

এখন শূদ্রগণ আপনাদের জন্মগত স্বাধিকার-সম্বন্ধে ক্রমেই অধিকতর সচেতন হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া গুণে ও কর্মে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের সমকক্ষ হইয়াছেন ও হইতেছেন। পক্ষান্তরে, ইদানীং নানা অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিসমূহের অধিকাংশ নরনারীই গুণে ও কর্মে একেবারে প্রাচীন শূদ্রস্তরে নামিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা-নির্বাহ-প্রণালীতে এই শ্রেণীর সহিত শূদ্রদের কোন বিষয়ে কোন পার্থক্য এখন আর দেখা যায় না। এই কারণে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতে এখন শূদ্রগণ অত্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁহারাই দেশের মেরুদণ্ড—জাতির প্রাণশক্তি। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই সংখ্যাবহুল শূদ্রগণের অপ্রতিহত প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী। কেবল ভারতবর্ষে নহে, পরন্তু পৃথিবীর সকল দেশেই ইঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ক্রমেই অধিক-মাত্রায় গণতন্ত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ইহার ফলে বিশ্বময় সংখ্যাবহুল শূদ্রজনসাধারণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে সকল দেশেই যে শূদ্রগণের একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে, ইহা নিশ্চিত।

ভারতে শূদ্র-জাগরণ আরম্ভ হইবার বহু পূর্বে

স্বামী বিবেকানন্দ দরিদ্র অজ্ঞ অবনত অনুন্নত লাঞ্ছিত শূদ্রগণের উন্নয়নের আবশ্যকতা বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করেন। হিন্দুসমাজ-দেহের মহাব্যাধি অস্পৃশ্যতা ও কর্মকৌলীন্য দূরীকরণের জন্যও তিনিই সর্বপ্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশের উন্নতি—জাতির অভ্যুদয় বলিতে তিনি দেশের আপামর জনসাধারণের—বিশেষ করিয়া সংখ্যাবহুল নিম্ন পতিত অবনত ও অনুন্নত জনগণের উন্নতি ও অভ্যুদয় বুঝিতেন। স্বামীজি বলিয়াছেন, "গরীব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো, তখন থেকেই ইউরোপ উঠতে লাগলো। * * বড় মানুষ, পণ্ডিত, ধনী, এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে কিছুই এসে যায় না, এঁরা হচ্ছেন শোভামাত্র—দেশের বাহার। কোটি কোটী গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ।" এই কারণে তিনি সকল বিষয়ে অধিকার-বঞ্চিত দেশের প্রাণশক্তিস্বরূপ নিম্ন পতিত অজ্ঞ দরিদ্র পদদলিত শূদ্রগণকে বিদ্যা ধর্ম সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে সমান অধিকার এবং সর্ববিধ উন্নতি-সাধনে সমান সুযোগ দানের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির

সুখ, সমষ্টিকে ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্ব অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য জগতের মূলভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতি-যোগে তাঁহাদের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্ত্তব্য। শুধু কর্ত্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব। * * বিদ্যা. বুদ্ধি. ধন, জন, বল, বীর্য্য, যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্ব্বার সঞ্চারের জন্য ; একথা মনে থাকে না, গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনি সর্ব্বনাশের সূত্রপাত।” স্বামীজির মতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি ইহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের পতন ঘটিয়াছে—প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছে। এখন বেশ দেখা যাইতেছে যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ধর্ম দর্শন বিদ্যা ও সংস্কৃতি মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া নিম্নশ্রেণীর আপামর জনসাধারণ উন্নত হইতে পারেন নাই, দেশও উন্নত হয় নাই।

এই সকল কারণে স্বামী বিবেকানন্দ দেশের প্রাণশক্তি শূদ্র জনসাধারণ হইতে নব-ভারতের অভ্যুদয় কামনা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণকে সম্বোধন করিয়া প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলিয়াছেন, “তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য

হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা, সনাতন দুঃখভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না, এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিন-রাত খাটা এবং কার্য্যকালে সিংহবিক্রম! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিক্যের আংটি ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও—হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া অমনি শুনবে কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি 'ওয়াহ গুরুকি ফতে'।" স্বামীজি যোগদৃষ্টিতে ভবিষ্য-ভারতের যে ছবি দেখিয়াছিলেন, ইহাই যে ভাবী ভারতের যথার্থ ছবি তাহাতে এখন প্রায় সকলেই নিঃসন্দেহ।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে শূদ্রজনগণের প্রাধান্য-স্থাপনের ফলে একটি সাংঘাতিক বিপদেরও আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে, শূদ্রজনসাধারণ যদি প্রাচীন ব্রাহ্মণদের বিদ্যা ধর্ম ত্যাগ সংযম সংস্কৃতি সত্য ন্যায় নীতি পরার্থপরতা, ক্ষত্রিয়দের শৌর্য বীর্য সভ্যতা, বৈশ্যদের কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি গুণবর্জিত হইয়া এবং প্রাচীন কালের শূদ্রসুলভ দোষগুলি অর্থাৎ ধর্ম বিদ্যা সংস্কৃতি সত্য ত্যাগ সংযম প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন থাকিয়া প্রাধান্য লাভ করে, তাহা হইলে ভারতের চিরন্তন গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যস্বরূপ ঐসকল সম্পদ্ একেবারে বিনষ্ট হইবে এবং ইহার ফলে সমগ্র জাতির অধঃপতন ঘটিবে। দুঃখের বিষয়, গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের শূদ্রগণের প্রভুত্ব-বিস্তারের সংগে সংগে ভারতের বিশেষত্ব ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি সত্য ন্যায় নীতি সংযম প্রভৃতির প্রতি এক শ্রেণীর শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ক্রমবর্ধমান উপেক্ষা দেখা যাইতেছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারতের সর্বত্র ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের অধিকাংশ নরনারীই গুণে ও কর্মে এখন শূদ্রস্তরে নামিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে ভারতের বিশেষত্বসমূহের প্রতি উপেক্ষা ক্রমেই অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে।

ইদানীং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ভারতের কোন কোন প্রদেশে রাষ্ট্রক্ষেত্রে গণতন্ত্রের আবরণে স্বেচ্ছাতন্ত্র চলিতেছে এবং

দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের জন্য অসত্য উৎকোচ ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনেকেই দ্বিধা করিতেছেন না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপীয় দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নাই।" কিন্তু তিনি আজ জীবিত থাকিলে দেখিতেন—ইতোমধ্যেই তাঁহার জন্মভূমিতেও সে দলের উদ্ভব হইয়াছে! বর্তমানে দেশের ব্যবসাক্ষেত্র হইতে সত্য ধর্ম ন্যায় নীতি প্রভৃতি প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন ব্যবসা বলিতে বুঝায়—কণ্ট্রোল রেশন পারমিট্ ভেজাল ব্ল্যাক্-মার্কেটিং স্মাগ্লিং ইত্যাদি! উচ্চ নিম্ন উভয় শ্রেণীর হাজার হাজার লোক—যাঁহারা কোন দিন ব্যবসা করেন নাই, তাঁহারাও সুযোগ পাইয়া এই ব্যবসা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। একই জেলার বিভিন্ন মহকুমায় পর্যন্ত খাদ্যাদির মূল্যের অত্যন্ত পার্থক্য ইহার প্রধান কারণ। দেখা যাইতেছে যে, এই ব্যাপক দুর্নীতি বন্ধ করিবার ভার যাঁহাদের উপর, তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশই সম্ভবতঃ ইহার সমর্থক বলিয়াই ইহা বন্ধ করা সম্ভব হইতেছে না! সমাজক্ষেত্রেও সকল বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য শহরে-বন্দরে চক্ষের সম্মুখেই দৃষ্ট হইতেছে। দেশের সকল ক্ষেত্রে চলিয়াছে দলাদলি ও প্রভুত্বের তাণ্ডব নৃত্য! আরও দেখা যাইতেছে যে, ইদানীং

কারণে ও অকারণে সরকারী বেসরকারী অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও শ্রমিকগণ দলবদ্ধভাবে ধর্মঘট করিয়া নানা বিষয়ে জনসাধারণের অসুবিধা সৃষ্টি করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেছেন না। অবশ্য এই শ্রেণীর পক্ষে স্বার্থরক্ষার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মঘট করা অত্যাবশ্যক, কিন্তু সকলক্ষেত্রে—কথায় কথায় ধর্মঘট অবৈধ—অন্যায়। ধর্ম ন্যায় নীতি যেন দেশ হইতে একেবারে নির্বাসিত হইতেছে! ইহার অবশ্যম্ভাবী কুফলগুলিও সংগে সংগেই ফলিতেছে। এখন দেশশুদ্ধ লোকের নানা বিষয়ে দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নাই। বর্তমানে সৎ পথে থাকিয়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই অনেকের পক্ষে অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে।

দেশের জনসাধারণের—বিশেষ করিয়া দেশ ও সমাজের পদস্থ পরিচালকগণের মধ্যে প্রাচীন শূদ্রদের দোষগুলির বা শূদ্রমনোবৃত্তির অর্থাৎ অধর্ম অসৎকর্ম অসৎনীতি প্রভৃতির ব্যাপক বিস্তারই এই শোচনীয় পরিস্থিতি-উদ্ভবের একমাত্র কারণ। এই গুরুতর সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ভারতের জাতীয় জীবনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য ধর্ম ও সংস্কৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারা যায় যাহাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ ঠিক ঠিক বজায় থাকিবে, অথচ

উহাদের দোষগুলি থাকিবে না, তাহা হইলে উহা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হইবে।" দুঃখের বিষয়—তাঁহার এই নির্দেশ-অনুসারে প্রাচীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের দোষগুলি ত্যাগ করিয়া গুণগুলি—বিশেষ করিয়া ভারতের চিরন্তন জাতীয় বিশেষত্ব ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি দেশের জনসাধারণকে দান করিবার উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা এপর্যন্ত করা হয় নাই। ইংরেজ অধিকারে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে দূরের কথা, স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের মধ্যেও এই অমূল্যরত্নরাজি বিতরণ করিবার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজের অধীনতা এবং ইহার ফলস্বরূপ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে এই সম্পৎসমূহ দান করিবার পক্ষে প্রবল অন্তরায় ছিল। অবশ্য অতি অল্পসংখ্যক ধর্মপ্রচারক এই সম্পদ্‌রাশি জনসাধারণকে দান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের ন্যায় বিরাট দেশের প্রয়োজনের তুলনায় তাঁহাদের চেষ্টা নগণ্য বলিলেও চলে। বড় বড় শহরে শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে এই সম্পদ্ দান করিবার অতি সামান্য চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু অগণন পল্লীগ্রামের জনসাধারণ—বিশেষতঃ দরিদ্র অজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এইগুলি বিতরণের জন্য এপর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ইহার ফল যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবে, ইহা স্বামী বিবেকানন্দ বুঝিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি ধর্ম দর্শন বিদ্যা সংস্কৃতি প্রভৃতি

আপামর জনসাধারণকে অকাতরে দান করিবার জন্য শিক্ষিত উচ্চবর্ণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরেজরাজ্যে অবাধ বিদ্যাচর্চ্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও।" কিন্তু তাঁহারা স্বামীজির এই আকুল আহ্বানে কর্ণপাত করেন নাই। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের অধিকাংশেরই শূদ্রবর্ণে অবনমনের ইহাও একটি প্রধান কারণ।

দেশব্যাপী এই কল্পনাতীত শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে শূদ্রযুগ বরণ করিয়া জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে শিক্ষিত-অশিক্ষিত উচ্চ-নিম্ন—এমন কি অহিন্দু অনার্য নরনারীকেও ভারতের গৌরবোজ্জ্বল সম্পদ্ ধর্ম দর্শন বিদ্যা সংস্কৃতি প্রভৃতি দান করিবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষকে আর্য্যভাবাপন্ন করিলে, আর্য্যাধিকার দিলে, আর্য্যজাতির ধর্ম্মগ্রন্থেওসাধনে সকলকে সমভাবে আহ্বান করিলে এই মহাবিপদ হইতে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব।" তাঁহার এই অমূল্য উপদেশ সর্বাংশে কার্যে পরিণত করিবার জন্য আমরা স্বাধীন ভারতের নেতৃবৃন্দ এবং ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

সমাজ-সংস্কারে

স্বামী বিবেকানন্দ

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের অভ্যুত্থান-সাধনের জন্য তাহার জাতীয় জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের উপরই সর্বাপেক্ষা বেশী জোর দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "ভারতের মূল স্রোত ধর্ম্ম; উহাকে প্রবল করা হউক—তবেই আনুষঙ্গিক অন্যান্য স্রোতগুলিও উহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।" ধর্ম-জাগরণ-আনয়ন তাঁহার লক্ষ্য হইলেও সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতাও তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সমাজের যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আবশ্যক—এবিষয়ে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত।" তাঁহার যোগদৃষ্টিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমাজের গুণ ও দোষ উভয়ই সমভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি উভয়ের

গুণগুলির যেমন প্রশংসা করিয়াছেন, দোষগুলির তেমন নিন্দা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি যা শিখেছি, যা বুঝেছি, তাই তোমাদের বলছি ; আমি তো আর বিদেশ থেকে তোমাদের হিতের জন্য আমদানী হইনি যে, তোমাদের আহাম্মকিগুলিকেও পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হবে ? বিদেশী বন্ধুর কি ? বাহবা লাভ হলেই হলো। তোমাদের মুখে চুণকালী পড়লে আমার যে মুখে পড়ে তার কি ?" এই ভাবের প্রেরণাই তিনি প্রকৃত হিতৈষিরূপে হিন্দুসমাজের দোষগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। বৈদেশিক লেখকদের ন্যায় 'বাহবা'-লাভের উদ্দেশ্যে বা হিন্দুজাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি হিন্দুসমাজের দোষোদ্ঘাটন করেন নাই। হিন্দুসমাজ যাহাতে দোষগুলি ত্যাগ এবং অতীতের ও বর্তমানের গুণগুলি গ্রহণ করিয়া আদর্শ সমাজে পরিণত হয়, ইহাই তাঁহার কাম্য ছিল।

অনেক দিন হইতেই বাহ্য দেশীয় ও আভ্যন্তরীণ বহু ভাবের ক্রমবর্ধমান আঘাতে হিন্দুসমাজ রূপান্তরিত হইতেছে। বর্তমানে হিন্দুসমাজের প্রায় সকল জাতিই নানাবিধ সম্মান-জনক অর্থকরী বৃত্তি-অবলম্বনের পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ায় এবং প্রাচীন ধরণের জাতিগত বৃত্তি দ্বারা অধিকাংশ জাতিরই জীবিকা নির্বাহিত না হওয়ায়, তাহারা গুণানুসারে সুবিধাজনক বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। যুগ-প্রয়োজনের প্রেরণায় এবং

আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাড়নায় সকল জাতিকে ক্রমেই অধিকমাত্রায় পূর্বতন অনেক সামাজিক রীতি-নীতি পরিহার করিয়া নূতন রীতি-নীতি গ্রহণ করিতে দেখা যাইতেছে। ইহার ফলে যতই দিন যাইতেছে, ততই হিন্দুসমাজ অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। ঋষি-প্রবর্তিত চাতুবর্ণ্য বা বর্ণাশ্রম ভারতের সকল প্রদেশ হইতে বহু পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে স্বামীজি বলিয়াছিলেন, “আমি ভারতবর্ষে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, কোথাও ঋষি-শাসনের ঠিক ঠিক প্রচলন নেই। কেবল লোকাচার দেশাচার আর স্ত্রী আচার এতেই সব জায়গায় সমাজ শাসিত হচ্ছে।” বর্তমানে হিন্দুসমাজ পূর্বাপেক্ষাও দ্রুতবেগে পরিবর্তিত হইতেছে। কিছুকাল পূর্বেও চতুর্বর্ণের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি যে সকল বৃত্তির উপর দাঁড়াইয়াছিল, ইদানীং দেশের অর্থনীতিক দুরবস্থায় তাহাদের অধিকাংশেরই জাতীয় বৃত্তি নষ্ট হওয়ায় তাহারা জীবন-রক্ষার জন্য যে বৃত্তি সম্মুখে পাইতেছে, তাহাই গ্রহণ করিতেছে। অনেকে জীবিকার্জ্জনের জন্য কোন বৃত্তি না পাইয়া অনশনে অর্ধাশনে ও রোগে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইতেছে। নদীর স্রোতের ন্যায় সমাজও প্রয়োজনের প্রেরণায় বাধাহীন পথেই চলিতেছে। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া সমাজ বর্তমানে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেছে, উহাদের মধ্যে সমাজের ভবিষ্যৎ জীবনের

পক্ষে কোন্‌টি ভাল এবং কোন্‌টি মন্দ তাহা ভাবী কালের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইবে। এই পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে সকলেরই স্মরণ রাখা দরকার যে, অতীতকালে সময়ে সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া হিন্দু-সমাজ রক্ষা পাইয়াছে, উহাদের মধ্যে কোন কোনটি পরিণামে হিন্দুজাতির পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই অতীতের দোষ ভবিষ্যতে যাহাতে না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলাই সকলের কর্তব্য।

ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, অতীত কালে কোন যুগেও কাঁহারও পরিকল্পনা-মূলে হিন্দুসমাজে পরিবর্তন উপস্থিত হয় নাই এবং হিন্দুসমাজের বর্তমান পরিবর্তন কাঁহারও পরিকল্পনায় হইতেছে না। যুগে যুগে সকল দেশের সভ্য নরনারী আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সমাজে আবশ্যক পরিবর্তন আনয়ন করেন। স্বামীজি লিখিয়াছেন, “সমাজের পশ্চাতে যখন তৎ-কালীন আবশ্যকতা প্রেরণা যোগায়, তখন আত্মরক্ষার জন্য সমাজ আপনা-আপনি কতকগুলি আচারের আশ্রয় গ্রহণ করে। ঋষিরা ঐ সকল আচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র।” ‘ভারতের ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, “সত্য-যুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ-জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত

হইলেন।" গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।' ঐতিহাসিকগণও বলেন যে, পূর্বে এক জাতি ছিল, তাহারা প্রয়োজনবশতঃ বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়। ঋষিগণ সমাজে শৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্য সকলকে গুণ ও কর্ম-অনুসারে চতুর্বর্ণে বিভক্ত করেন। সভ্য মানব-সমাজে যে সকল বৃত্তি প্রচলিত আছে, উহাদিগকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিলে বলা যায় যে, পৃথিবীর প্রত্যেক সমাজেই একদল নরনারী ব্রহ্মাণ, একদল ক্ষত্রিয়, একদল বৈশ্য ও একদল শূদ্রবৃত্তি-অবলম্বনে জীবনযাত্রা-নির্বাহ করিতেছে। কাজেই গুণ ও কর্মমূলক চতুর্বর্ণ-বিভাগ সভ্য মানব-সমাজের স্বাভাবিক বিভাগ। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলিয়াছেন, 'এইরূপ জাতি-বিভাগ জরথুষ্ট্রীয় ব্যাবিলনীয় মিশরীয় ও টিউটনীয় জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল।' যাহা হ'ক, কালক্রমে ঋষি-নির্দিষ্ট গুণ ও কর্মগত চতুর্বর্ণ সংখ্যাতীত বিপ্লবের ফলে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়া অনেক কাল হয় বংশগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে চাতুর্বর্ণ্যের মূলনীতি হইতে হিন্দুসমাজ একেবারে ভ্রষ্ট হয় নাই। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই নীতিকে আঁকড়াইয়া থাকার জন্য হিন্দুজাতি অনেক বিপ্লবকে প্রতিহত করিয়া আজও বাঁচিয়া আছে। হিন্দুধর্মাচার্য শংকর রামানুজ মধ্ব নিম্বার্ক চৈতন্য

প্রভৃতি তাঁহাদের সমসাময়িক সমাজ-পরিবর্তনের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করেন নাই। পক্ষান্তরে তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের সমসাময়িক সামাজিক পরিবর্তনকে বরণ করিয়া হিন্দুর চিরন্তন চাতুর্বর্ণ্য-নীতিমূলে যুগোপযোগী সমাজ-সংস্কারের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন।

যুগধর্মাচার্য স্বামী বিবেকানন্দও প্রাগুক্ত ধর্ম-প্রবর্তকদের পদাঙ্ক-অনুসরণে সমাজ-সংস্কার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ঋষিদের মত চালাতে হবে ; মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষির মন্ত্রে দেশটাকে দীক্ষিত করতে হবে। তবে সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করে নিতে হবে। এই দেখ না, ভারতে কোথাও চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগ দেখা যায় না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার জাতে দেশের লোকগুলোকে ভাগ করতে হবে। সব বামুন এক ক'রে একটি বামুন জাত গড়তে হবে। এইরূপ সব ক্ষত্রিয়, সব বৈশ্য, সব শূদ্রদের নিয়ে অন্য তিনটি জাত করে সকল জাতকে বৈদিক প্রণালীতে আনতে হবে।" এই অভিমত দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামীজি কেবল ভারতের কোন এক প্রদেশের নয়, পরন্তু সকল প্রদেশের সকল ব্রাহ্মণ, সকল ক্ষত্রিয়, সকল বৈশ্য ও সকল শূদ্র-সমবায়ে মূলতঃ চারিটি জাতিতে হিন্দুজাতিকে বিভক্ত করিয়া প্রথমতঃ প্রত্যেক জাতির সকল শ্রেণীর মধ্যে আহারাদি

সর্ববিধ সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে একান্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁহার মতে "জাতিভেদে বিবাহ্ স্থগিত করা, এক জাতির মধ্যে বহুশাখা-ভেদ হইয়া তাহাদের মধ্যে আদান-প্রদান বন্ধ হওয়া, তাহার উপর কৌলীন্য প্রথাদ্বারা বিবাহের পরিধি আরও সংকীর্ণ হওয়ায় রক্ত দূষিত হইয়া জীবনীশক্তি ও বলের অত্যন্ত ক্ষয় হইতেছে। ইহার প্রতিবিধান করিতে গেলে প্রথমতঃ প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে সকল অবান্তর বিভাগ আছে, উহাদের মধ্যে যাহাতে আদান-প্রদান হয়, তাহার উদ্যোগ করা উচিত।" ইহা সত্য যে, প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত অবান্তর বিভাগ শাস্ত্রগত ও বস্তুগত নয়, ইহা সম্পূর্ণ দেশাচারগত ও অবাস্তব। এই অবস্থা দেখিয়াই মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি প্রশ্ন করিয়াছিলেন —'জাতিতে জাতিতে ভেদ কি গো-অশ্বের তুল্য ভেদ যে চোখে দেখা যায়?' যাহা হ'ক, স্বামীজীর নির্দেশ-অনুসারে সমগ্র ভারতের ব্রাহ্মণাদি চারিজাতির প্রত্যেকটির অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি যদি এক একটি জাতিতে পরিণত হয় এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান চলে,তাহা হইলে হিন্দুর জাতিভেদের কুফল বহুলাংশে বিদূরিত হইবে। ইহার ফলে হিন্দুসমাজ বিভিন্ন শ্রেণীর ভোগের অধিকার-বৈষম্য ও উচ্চনীচ ভাবসম্ভূত ভেদ বিরোধ অস্পৃশ্যতা অনাচরণীয়তা অনৈক্য ও অসামঞ্জস্য হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই

সাম্য-মৈত্রীর যোগ্যতা অর্জন করিবে। ইহা কার্যে পরিণত হইবার পথে প্রবল অন্তরায়—সমগ্র ভারতের ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের প্রত্যেকটির অন্তর্গত বহু উপজাতির শিক্ষা রীতিনীতি ও আর্থিক অবস্থাগত আকাশ-পাতাল অসমতা। এই তিনটি বিষয়ে সমতা না থাকিলে বিভিন্ন জাতি দূরের কথা, কোন এক জাতির মধ্যেও ব্যাপকভাবে বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই সমগ্র ভারতের ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের প্রত্যেকটির অন্তর্গত যে সকল উপজাতির মধ্যে ঐ তিনটি বিষয়ে সমতা আছে, তাহাদের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া প্রথমতঃ তাহাদিগকে এক জাতিতে পরিণত করা দরকার। পরে ঐ জাতিসমূহের মধ্যে ঐ তিনটি বিষয়ে অনুন্নত জাতিগুলিকেও যতশীঘ্র সম্ভব উন্নত করিয়া তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ইহাই হিন্দুসমাজে ঋষি-প্রবর্তিত চাতুর্বর্ণ্য বা বর্ণাশ্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উপায়। এইভাবে সকল জাতির সকল নরনারীকে ক্রমশঃ গুণে ও কর্মে ব্রাহ্মণত্বে উপনীত করাই ইহার আদর্শ।

স্বামী বিবেকানন্দ গুণ ও কর্মগত স্বাভাবিক চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগ সমর্থন করিলেও হিন্দুসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন জাতির ভোগের অধিকার-বৈষম্যের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ-

ক্ষত্রিয়াদি জাতিবিভাগ দোষের নহে, কিন্তু ভোগাধিকার-তারতম্যই মহা অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" বর্তমান কালেও হিন্দুসমাজের অসংখ্য জাতির মধ্যে অধিকাংশ জাতিই সমাজের দিক দিয়া নানা বিষয়ে অধিকার হইতে বঞ্চিত। এ যুগেও হিন্দুসমাজ স্বাধীনভাবে বিদ্যার্জনে, অর্থোপার্জনে ন্যায়সংগত কামনা-পূরণে ও মোক্ষলাভে বহু নিম্নজাতির অধিকার সামাজিক দিক দিয়া কার্যতঃ স্বীকার করে না। ইদানীং দেখা যাইতেছে যে, এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ তাঁহাদের জাতীয় বৃত্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া বৈশ্য ও শূদ্রবৃত্তি-অবলম্বনে জীবিকানির্বাহ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেছেন না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁহারাই নিম্নশ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষেও রাজকার্য ও অন্যান্য সম্মানজনক বৃত্তি-অবলম্বনে জীবিকানির্বাহ করা 'বর্ণাশ্রমস্বরাজ্য'-প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী বলিয়া প্রচার করিতেছেন! মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি স্বার্থসাধনে নিয়োজিত হইলে এইরূপ অযৌক্তিক আকারই ধারণ করে। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়াই স্বামীজি বলিয়াছেন, "যদি কারো আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা-ভরসা নাই, সে গেল! কেন হে বাপু, কি অত্যাচার? এ দেশের (আমেরিকার) সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, opportunities (সুবিধা) আছে। আজ যে গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান্ হবে, জগৎমান্য হবে। * *

হে ভগবান্, আমরা কি মানুষ? ঐ যে পশুবৎ হাড়ি, ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ বলতে পার? তোমরা তাদের ছোঁও না, দূর দূর কর, আমরা কি মানুষ?"

লক্ষ্যের বিষয়—একালেও নিম্নকুলোদ্ভব সর্বগুণসম্পন্ন 'মহাপণ্ডিতের বা কোটীশ্বরের'ও হিন্দুসমাজে উচ্চস্থানলাভের অধিকার নাই। অহিন্দু জাতির কোন বিশ্ববিখ্যাত মনীষী বা অতি ধার্মিক রাজাকেও হিন্দুসমাজ তাহার অঙ্কে স্থান দিতে একেবারে অসমর্থ। ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, হিন্দুর গৌরবময় যুগে হিন্দুসমাজে এরূপ সংকীর্ণতা ছিল না। তখন বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, ধীবরকন্যাজাত বেদব্যাস, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, অজ্ঞাতপিতৃক কৃপ দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি সমাজের নিম্নস্থান হইতে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার পরবর্তী যুগেও হাজার হাজার গ্রীক শক হূণ প্রভৃতি অহিন্দু জাতি হিন্দুসমাজের বিরাট অঙ্গে অঙ্গীভূত হইয়াছে। অহিন্দু জাতিকে গ্রহণ ও নিম্নজাতিকে উন্নয়ন করিবার অসামর্থ্য হিন্দুসমাজের বিস্তৃতি ও উন্নতির পথে প্রবল বাধা। এ বাধা বিদূরিত না হইলে হিন্দুজাতির অভ্যুদয় একেবারেই সম্ভব হইবে না। ভারতের সকল প্রদেশেই এখনও বহু আদিম অধিবাসী রহিয়াছে। তাহাদিগকে আর্য-ধর্ম ও

আর্য-সংস্কৃতি দিয়া হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারিলে তাহারা ক্রমেই অহিন্দু জাতির কবলিত হইবে এবং ইহার পরিণতি হিন্দু-ভারতের পক্ষে মহা অনিষ্টের কারণ হইয়া দাড়াইবে। অবশ্য ধর্মক্ষেত্রে নিম্নজাতির অধিকার হিন্দুরা বরাবর স্বীকার করিতেছে। ভারতের সকল প্রদেশেরই নিম্নকুলোদ্ভব ধর্মাচার্যগণ সমাজের দিক দিয়া না হইলেও ধর্মের দিক দিয়া ব্রাহ্মণদের দ্বারাও সম্মানিত। হিন্দুজাতির সমাজক্ষেত্রে কোন স্বাধীনতা নাই, কিন্তু ধর্মক্ষেত্রে সকলেরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। স্বামীজি বলিয়াছেন, "আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ধর্ম্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাহাতেই আমাদের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি গুরু শৃঙ্খল পরাইলেন। এই জন্য আমাদের সমাজ দু'চার কথায় বলতে গেলে ভয়াবহ পৈশাচিকতাপূর্ণ! পাশ্চাত্ত্যদেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে; তাহাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ। আবার অপর দিকে তাহাদের ধর্ম্ম কিরূপ তাহার দিকেও দৃষ্টিপাত করিও। উন্নতির মুখ্যসহায় স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া-দাওয়া, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না উহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়।"

এখন আর এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, হিন্দু-সমাজপতিগণের অদূরদর্শিতার জন্যই হিন্দুসমাজের অবনত অনুন্নত শ্রেণীর কোটি কোটি নরনারী অজ্ঞতা এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি-স্বরূপে দারিদ্র্যের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত থাকিয়া আজও পশুতুল্য জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। উচ্চবর্ণের নির্মম অত্যাচারে নিম্নবর্ণের বহুসংখ্যক ব্যক্তি মুসলমান ও খৃষ্টান হইয়াছে ও হইতেছে। উচ্চশ্রেণীর হৃদয়হীন ব্যবহারে হিন্দুর ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি স্বদেশ স্বজাতি স্বধর্মাবলম্বিগণকে নিম্নশ্রেণীর জনগণ আপনার বলিয়া মনে করিবার সুযোগ পায় নাই। এইজন্য এই সকল সম্পদের প্রতি তাহাদের মমত্ববোধ বা দরদ জন্মিতে পারে নাই। এই কারণে বৈদেশিকদের ভারত-অধিকারে এই বিরাট জনসংঘ স্বেচ্ছায় কোন বাধা তো দেয়ই নাই, বরং অনেকে স্বদেশী ও স্বধর্মাবলম্বীদের অত্যাচার অপেক্ষা বিদেশী ও বিধর্মীদের আশ্রয়-গ্রহণ বরণ করিয়া লইয়াছে। তাহারা সংঘবদ্ধভাবে সামান্য বাধাদান করিলেও মুষ্টিমেয় বৈদেশিক আক্রমণকারীর পক্ষে পুনঃ পুনঃ ভারত-আক্রমণ সম্ভব হইত না এবং সমগ্র উত্তর-ভারতের প্রাচীন মঠ-মন্দিরগুলিও একেবারে নিশ্চিহ্ন হইত না। ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, ভারতের নিম্নশ্রেণীর জনগণ বিদেশী ও বিধর্মী শাসকদের নিকটে সময়ে সময়ে বহুবিষয়ক উন্নতিলাভের অনেকটা স্বাধীনতা পাইয়াছে, কিন্তু

দুঃখের বিষয়—তাহাদের জন্মগত অধিকারগুলি স্বদেশী ও স্বধর্মাবলম্বিগণের নিকট দাবী করিয়া এখনও পাইতেছে না। এইজন্য তাহাদের মধ্যে একশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীর উপর বিশ্বাস হারাইয়াছেন। এই কারণে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগদান করিতে দ্বিধা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, স্বাধীন ভারতে উচ্চশ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহার ফলে সকল বিষয়ে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষিত হইবে না। বর্তমানেও উচ্চশ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাদের ন্যায্য স্বত্ব ও অধিকার পরিপূর্ণরূপে রক্ষিত হইতেছে না। এইজন্য তাঁহারা সরকারী চাকুরি ও ব্যবস্থা-পরিষদ্ প্রভৃতিতে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক অধিকার-সংরক্ষণ-নীতি দাবী করিতেছেন। (এই কারণেই ইংরেজ-আমলে রাষ্ট্রক্ষেত্রে 'কাষ্ট হিন্দু ও তপসিলভুক্ত শ্রেণী' নাম দিয়া হিন্দুজাতিকে দ্বিধা বিভক্ত করা সম্ভব হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতেও তপশিলভুক্ত জাতিদের সমস্যা হিন্দুজাতির স্বগৃহে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় সংহতির পথে এক প্রধান বিঘ্ন)

হিন্দুসমাজের এইসকল সমস্যা সমাধান করিয়া হিন্দুজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইলে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় "আচণ্ডালে যাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অধিকার-সহায়তা হয়, তাহা করিতে হইবে।" এজন্য জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে

সমাজের সকল নরনারীকে সকল বিষয়ে উন্নতিলাভের সম্পূর্ণ অধিকার ও সুযোগদান অপরিহার্য। এই ব্যক্তিস্বাধীনতার কালে—এই গণতন্ত্রের যুগে ধর্ম ও সমাজরক্ষার নামে কোন ব্যক্তি জাতি বা শ্রেণীর উন্নতির দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখা অসম্ভব। ইহা মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারের চরম নিদর্শন বলিয়া এখন পরিগণিত। ভগবান্ কোন মানুষকে এই অধিকার দেন নাই। সমাজের উচ্চস্তরে স্থাপিত এক শ্রেণীর ব্যক্তিগণ স্বার্থান্ধ হইয়া এতকাল এই নৃশংস উৎপীড়ন সমাজের উপর চালাইয়াছেন। ইহারই ফলে হিন্দুজাতির অবনতি ঘটিয়াছে। হিন্দুজাতি ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি প্রভৃতিতে জগতের যে কোন জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া আজও এত অধঃপতিত কেন? তাহাদের এই সম্পদরাশি মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে বলিয়া। ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী পুরোহিতগণ। স্বামীজি বলিয়াছেন, "প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে পুরোহিতের এই অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই (হিন্দু) ধর্ম্মই জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মত কি করিতে পার? আমার বিশ্বাস—ইহা কার্য্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।" সুখের বিষয়—সকল প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া হিন্দুসমাজের গতি এখন এই দিকেই দেখা যাইতেছে। এ যুগে অভিজ্ঞতামূলে

হিন্দুসমাজের অভিজাত সম্প্রদায়সমূহের বুঝা উচিত যে, দেশের নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের উত্থান-পতনের সহিত তাঁহাদের উত্থান-পতন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। হিন্দুসমাজের অধিকার-নিরাকৃত জাতিসকল এখন আর পূর্বের ন্যায় নিদ্রিত নয়। স্বামীজি লিখিয়াছেন, "নিরাকৃত জাতিসকল আপনাদের লুপ্ত অধিকার পুনর্ব্বার চাহিতেছে। এ সময়ে যদি বিদ্যা ধর্ম্ম ইত্যাদি জাতিবিশেষে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সে বিদ্যা ও সে ধর্ম্মের নাশ হইবে।" এ যুগে দেশ-বিদেশের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা ও মানুষের সমান অধিকার-বার্তা নিম্নশ্রেণীসমূহের কর্ণেও প্রবেশ করিতেছে। তাহারা আপনাদের জন্মগত স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে ক্রমেই অধিকতর সচেতন হইয়া উহাদের দাবী করিতেছে। ইংরেজরাজ তাহাদের অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন। দেশ-বিদেশের অহিন্দু জাতিসমূহ তাহাদের ন্যায্য দাবী সমর্থন করিতেছেন। ইতোমধ্যেই স্বাধীন ভারতের গণপরিষদ্ (Constituent Assembly) কর্তৃক ভারতবর্ষ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Republican State) বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই গণতান্ত্রিকতা বা প্রজাতান্ত্রিকতার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া গণ-পরিষদের সভ্যগণ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে স্বাধীন ভারতের সকল নরনারীর সকল বিষয়ে সমান অধিকার এবং উন্নতিলাভের সমান সুযোগ

ঘোষণা করিয়াছেন। (তাঁহাদের চেষ্টায় গত ১৯৪৮ সনের ২৯শে নভেম্বর উক্ত গণ-পরিষৎ কর্তৃক 'অস্পৃশ্যতা' বিলুপ্ত এবং কোন আকারে উহা প্রতিপালন দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এইজন্য এই দিনটি ভারতের পাঁচ কোটি অস্পৃশ্যের মুক্তির দিন বলিয়া ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এ অবস্থায় ভবিষ্যতে সমাজ ও ব্যবহার-ক্ষেত্রে যদি অস্পৃশ্যতা কোন আকারে প্রতিপালন করা হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের বিরোধ এবং ইহাতে সমাজের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। যোগদৃষ্টি-সহায়ে এই দৃশ্য দেখিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ বহুকাল পূর্বে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন। অভিজাত জাতিসমূহের পক্ষে যে এ যুগে অস্পৃশ্য ও নিম্ন জাতিগুলির ন্যায্য অধিকারসমূহ অস্বীকার করা চলিবে না, ইহা বিশেষরূপে বুঝিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, "একচেটিয়া অধিকারের দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন প্রত্যেক অভিজাত জাতির কর্ত্তব্য নিজের সমাধি নিজে খনন করা; আর যত শীঘ্র তাঁহারা এ কার্য্য করেন, ততই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল। যত বিলম্ব করিবেন, ততই উহা পচিবে এবং আর উহার মৃত্যুদণ্ড ততই ভয়ানক হইবে!" স্বামীজির এই সতর্কবাণী অভিজাত ব্যক্তিগণের বিশেষভাবে স্মরণীয়।

অবশ্য অভিজাত জাতির পক্ষ হইতে নিম্নজাতির সকল বিষয়ে সমান অধিকার এবং উন্নতিলাভের সমান সুযোগ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ঘোষিত হইলেই হিন্দুদের মধ্যে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইলে অবনত অনুন্নত জাতিসমূহের সকল নরনারীকে শিক্ষা রীতিনীতি ও আর্থিক অবস্থায় অভিজাত জাতির সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। বর্তমানে এই তিনটি বিষয়ে উচ্চ ও নিম্নজাতিসমূহের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বিদ্যমান। উচ্চ শ্রেণীগুলি এই কয়টি বিষয়ে উন্নত এবং নিম্নশ্রেণীসমূহ এইগুলিতে অত্যন্ত অনুন্নত। উভয় শ্রেণীর এই পার্থক্যই উভয়ের মিলনের পথের প্রধান বিঘ্ন। ইহা বিদূরিত না হইলে হিন্দুর স্বগৃহে ঐক্যস্থাপন ও জাতীয় অভ্যুদয় সম্ভব হইবে না। হিন্দুসমাজের উচ্চ-নীচ জাতি-পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য উভয় জাতিই সমভাবে দায়ী। এইজন্য উভয়কেই প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া এই মহা অনর্থ দুর করিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে, নিম্নজাতিসমূহের মধ্যে এক শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের দুর্দশার জন্য অভিজাত শ্রেণীর উপর দোষারোপ করিয়াই কর্তব্য শেষ করেন। এই শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি বলিয়াছেন, "জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার—সাম্যভাব আনিবার একমাত্র

উপায়—উচ্চবর্ণের শিক্ষা—যাহা লইয়া তাঁহাদের তেজ ও গৌরব—স্বায়ত্তীকরণ। তাহা যদি করিতে পার, তোমরা যাহা চাহিতেছ, তাহা পাইবে।” পক্ষান্তরে, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, স্মরণাতীত কাল হইতে অভিজাত শ্রেণীই বিদ্যাদি হইতে বঞ্চিত করিয়া এবং শত বিধি-নিষেধের পেষণে নিম্নশ্রেণীর এই শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বামীজি বলিয়াছেন, “আমাদের অভিজাত পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের দেশের সাধারণ লোককে পদদলিত করিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ তাহারা একেবারে অসহায় হইয়া পড়িল ; এই অত্যাচারে এই দরিদ্রগণ—তাহারা যে মনুষ্য, তাহাও ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল। * * আমরাই আমাদের দেশের নীচ জাতিকে নীচ করিয়াছি।” প্রবাদ আছে যে, যে সাপে কামড়ায়, সেই সাপ যদি স্বেচ্ছায় বিষ তুলিয়া নেয়, তাহা হইলে রোগী আরোগ্যলাভ করে। নিম্নজাতিসমূহের নিম্নত্বের জন্য অভিজাত জাতিসমূহ অনেকটা দায়ী, কাজেই তাঁহাদিগকেই নিম্নজাতিগুলিকে উন্নত করিতে হইবে। এখন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণকে শিক্ষা সংস্কৃতি ও আর্থিক বিষয়ে অভিজাত শ্রেণীর সমপর্যায়ে উন্নত না করা পর্যন্ত হিন্দুর জাতীয় উন্নতি

সম্ভব হইবে না। কারণ, হিন্দুর জাতীয় উন্নতির অর্থ হিন্দুজনসাধারণের উন্নতি। ভারতের স্বাধীনতাকে জয়যুক্ত করিতে হইলে জনগণকে—বিশেষ করিয়া অবনত অনুন্নত নিম্নশ্রেণীর নরনারীগণকে সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যাপক বন্দোবস্ত করিতেই হইবে। তাঁহারা যাহাতে উন্নত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিকার্য ও নানাবিধ শিল্প-অবলম্বনে এবং তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও সমর্থ ব্যক্তিগণ যাহাতে উচ্চশ্রেণীর ন্যায় সম্মানজনক চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে জীবিকার্জন করিতে পারেন, উহার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। এই ভাবে হিন্দুসমাজের সকল জাতি সকল বিষয়ে স্বাধীনতা পাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার সংস্কারসঞ্জাত গুণ ও কর্ম-অনুসারে নিজ নিজ জাতি সৃষ্টি করিয়া স্বার্থ ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনের প্রেরণায় আপনা-আপনি চতুর্বর্ণে বিভক্ত হইবে। এ সম্বন্ধে স্বামীজি লিখিয়াছেন, “প্রত্যেক হিন্দুই জানে যে, জ্যোতিষীরা জন্মিবামাত্র বালক-বালিকার জাতি-নির্ব্বাচন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। উহাই প্রকৃত জাতি, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজত্ব, ব্যক্তিত্ব, আর জ্যোতিষ ইহা মানিয়াছেন। আমরা যদি পূর্ণ তেজে ইহাকে চলিতে দিই, তবেই কেবল আমরা উঠিতে পারিব। আর এই বিচিত্রতার অর্থ বৈষম্য বা কাহারও

বিশেষ সুবিধা নহে। আমার ইহাই কার্য্যপ্রণালী; হিন্দুদের দেখান যে, তাহাদের কিছুই ছাড়িতে হইবে না, কেবল ঋষি-প্রদর্শিত পথে চলিতে হইবে ও শত শত শতাব্দীর দাসত্বের ফলস্বরূপ এই জড়ত্ব ছাড়িতে হইবে।" যুগধর্ম্ম-নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত এই সংস্কার-প্রণালীই যে হিন্দুর সামাজিক সমস্যার সমাধান, হিন্দুসমাজে সাম্য-মৈত্রী-প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দুজাতির অভ্যুদয়ের একমাত্র পথ, ইহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

ত্যাগ-মাহাত্ম্য-ঘোষণায়

স্বামী বিবেকানন্দ

বর্তমান যুগে এক শ্রেণীর পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভোগের মাহাত্ম্য-কীর্তন করিতে অগ্রসর হইয়া ত্যাগের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। ইহারা ইন্দ্রিয়-ভোগের জগৎজোড়া সৌধরচনায় বদ্ধপরিকর। ত্যাগের বিরুদ্ধে ভোগের অভিযানের ফলে এক শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্ট হইতেছে এবং আধুনিক নব্যশিক্ষিত প্রগতিপন্থী ব্যক্তিদের মধ্যে ইহা ক্রমেই অধিক মাত্রায় বিস্তারলাভ করিতেছে। এই অভিযানকারিগণ মোটামুটি তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত :—একদল জগতের সর্বত্র সকল কালেই দেখিতে পাওয়া যায়—যাঁহারা বিশ্ব-নিয়ামক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না এবং এই পৃথিবী অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, স্ত্রী-পুরুষের সমবায়ে উৎপন্ন ও কালমূলক

বলিয়া মনে করেন। 'যেন তেন প্রকারেণ' সুখে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করাই এই চার্বাকপন্থীদের আদর্শ। অনেকে ধর্মের আবরণে এই মতাবলম্বী। সাহসপূর্বক প্রকাশ্যভাবে স্বীকার না করিলেও সম্ভবতঃ পৃথিবীতে এই শ্রেণীর লোকেব সংখ্যাই এখন বেশী। এই কামভোগপবায়ণ ব্যক্তিগণের নিকট 'ত্যাগ' অর্থহীন শব্দমাত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই সম্প্রদায় 'আসুরিক' নামে আখ্যাত।

সেই প্রাচীন নিরীশ্বরবাদিগণের নব্যসংস্করণ-রূপে বর্তমান জগতের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক কারণে সমুদ্ভূত একশ্রেণীর প্রগতিপন্থিগণ বলিতেছেন, 'ঈশ্বরাস্তিত্বের বিজ্ঞান-সম্মত কোন প্রমাণ নাই, ভগবান্ ভীতি-বিহ্বল মানব-মনের দৌর্বল্যপ্রসূত কল্পনা ; সমাজের উচ্চস্তরে স্থাপিত একশ্রেণীর বুদ্ধিমান লোক নিম্নস্তরের ইতর-সাধারণ অজ্ঞ লোকদের পরিশ্রমে জীবন-ধারণ করিবার মতলবে তাহাদের মস্তিস্কের ভিতর নানা কৌশলে পরলোকের মিথ্যা ভয় চাপাইয়া রাখিয়াছেন!' ত্যাগ বা আত্মসংযম এই শ্রেণীর নিকট আত্ম-পীড়ন (self-repression) এবং ইন্দ্রিয়-বিলাসের (self-expression) অন্তরায়! ইঁহাদের মতে যৌন-আকর্ষণ যৌবনের স্বাভাবিক বিকাশ, ইহাকে তথাকথিত মন্ত্রপূত বিবাহ-রূপ কুসংস্কারের দোহাই দিয়া শাস্ত্র-কল্পিত সতীত্বের গণ্ডিতে আবদ্ধ করা দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার! ইঁহারা

চুক্তিবদ্ধ 'সহচর-বিবাহ' (companionate marriage) সমর্থন করেন! দুঃখের বিষয়, অনেক বিদুষীও ইদানীং এই জঘন্য দুর্নীতি-প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। ইদানীং বাংলাদেশের কয়েকটি মাসিক পত্রিকায় এইগুলির সমর্থন দেখা যাইতেছে। গল্পের ভিতর দিয়া আর্টের নামে অনেক নব্য সাহিত্যিক মানুষের যৌন আকর্ষণকে নগ্ন মূর্তিতে নানাভাবে রূপায়িত করিয়া দেখাইতেছেন! এই কুরুচিপূর্ণ সাহিত্যের ক্রমবর্ধমান প্রসারে দেশের তরুণ-তরুণীগণের নৈতিক জীবন আক্রান্ত হইতেছে। জাতির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে এই উগ্র অসংযমের প্রতিকার একান্ত আবশ্যক।

এই উদীয়মান সাহিত্যিকগণ বলেন, 'আর্টের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যকে রূপ দিয়া মানুষকে আনন্দদান। আর্টকে নিবৃত্তি-মার্গে টানিয়া আনিয়া ইহার সর্বতোমুখী সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি হইতে ইহাকে বঞ্চিত করিলে সাহিত্যের একদিক অসম্পূর্ণ থাকিবে।' আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মতে আর্টের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—মানুষের জীবনে সত্য শিব ও সুন্দরকে মূর্ত করিয়া তাহাকে পূর্ণত্ব দান। 'আর্টের জন্য আর্ট' (Art for art's sake) অজুহাতে ভালমন্দ বিচার না করিয়া সাহিত্যের সেবা করিলে মানব-সমাজ অসত্য অশিব ও অসুন্দরের কুৎসিত লীলাস্থল হইয়া দাঁড়াইবে। স্বামীজি নারীজাতির মাতৃত্ব সতীত্ব

লজ্জাশীলতা সংযম ত্যাগ প্রভৃতি প্রাচ্যসুলভ গুণের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য মহিলাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য স্বাধীনতা কর্মকুশলতা প্রভৃতি গুণের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাঁহাদিগকে পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার দান করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। আমাদের বিশ্বাস—ইহাই আদর্শ নারীসমাজ-গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায়। ঈশ্বরবিশ্বাসহীন প্রগতিপন্থিগণ তাঁহাদের মতবাদের মূলনীতি হিসাবে উলঙ্গ ভোগ-স্বার্থের মহত্ত্ব প্রচার করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, ভোগ মানুষের মহত্ত্বের সকল দিক নহে; অধিকাংশ নরনারীর ভোগ-বিলাস সংযম-হীন নগ্নমূর্তি ধারণ করিলে ফৌজদারি বিচারালয়ে অত্যন্ত ভিড় হইবে এবং পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্যনির্ণয় করা বিশেষজ্ঞদের গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে!

অপর এক শ্রেণীর প্রথিতযশাঃ ব্যক্তিগণ ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়াও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন বা অনুভব করিবার উদ্দেশ্যে সর্বস্বত্যাগ বা সন্ন্যাসকে 'অপ্রাকৃত' বলিয়া মনে করেন! সৃষ্টির বৈচিত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়া যৌন-সংযম-নীতির উপর এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ 'একান্ত ঝোঁক' দেওয়ার পক্ষপাতী নন। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার মধ্যে 'মানুষের মানসিক দৈহিক সর্বাঙ্গীণ প্রকৃতির পরিপূর্তির একটা স্থান আছে' মনে করিয়া এই খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সন্ন্যাসকে 'প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করেন! ইঁহাদের

মতে 'পবিত্র গার্হস্থ্যজীবনে আপনাকে ফলন্ত ও বিকশিত এবং বানপ্রস্থের আহ্বানে জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-শক্তি লোককল্যাণার্থ সঞ্চারিত করিয়া ব্রহ্মানুভূতির মধ্যে ডুব দেওয়ার চরম অধিকার-অর্জনই মানুষের আদর্শ জীবন-নীতি!' এই মতবাদিগণ প্রবৃত্তি বা ভোগ-মূলক আশ্রমধর্ম এবং নিবৃত্তি বা ত্যাগমূলক মোক্ষধর্মের অধিকার-ভেদ অস্বীকার করেন। প্রাকৃতিক বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভোগ বা প্রবৃত্তির পথে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া সকল মানুষকে ভগবৎসান্নিধ্যে উপনীত করাই আশ্রমধর্মের উদ্দেশ্য। বর্ণচতুষ্টয়ের গুণগত স্বধর্মও এই একই লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত। স্বামী বিবেকানন্দ আশ্রমধর্মকে সাধারণ নরনারীর মোক্ষলাভের সহায়ক প্রতিপন্ন করিয়া ত্যাগ বা নিবৃত্তি-পথে ভগবৎ-লাভের উপর অত্যন্ত জোর দিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রমতে চরম উদ্দেশ্যের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই; যতকিছু প্রভেদ ত্যাগ ও ভোগ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-পথ লইয়া।

এস্থলে প্রশ্ন এই—"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—'যাঁহাকে লাভ করিলে অন্য প্রকার কোন লাভ অধিক মনে হয় না', "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ মনসো যে মনো বিদুঃ"—'যিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, মনের মন, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর অপ্রাপ্য কিছু থাকে না', সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করাই যাঁহারা

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও কাম্য বলিয়া আন্তরিকভাবে অনুভব করেন, তাঁহাদের পক্ষে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টা কি 'অপ্রাকৃত', না অত্যন্ত স্বাভাবিক? যেমন তীব্র ক্ষুধা হইলে ভোজন ভিন্ন অন্য কার্যে রুচি হয় না, যেমন জ্বলিতমস্তক পুরুষ অন্য কাজ ত্যাগ করিয়া জলাশয়ের নিকট দ্রুত গমন করেন, তেমন ভাবে যদি কাঁহারও শ্রীভগবান্‌কে প্রত্যক্ষানুভব করিবার জন্য আগ্রহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই অবস্থাকে 'প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' বলিয়া অভিহিত করা কি সমীচীন? সন্ন্যাস বা ত্যাগের পথগ্রহণে 'প্রকৃতির বৈচিত্র্য ক্ষুণ্ণ' বা 'প্রকৃতির পরিপূর্তি' হয় কি না-হয়, মুমুক্ষুর সে দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর কোথায়? শ্মশান-বৈরাগ্য বা মর্কট-বৈরাগ্যের কথা বলিতেছি না,—"ব্রহ্ম এব নিত্যং বস্তু ততঃ অন্যৎ অখিলম্ অনিত্যম্"-জ্ঞান যদি কাঁহারও বিবেকে সত্যই বদ্ধমূল হয়, তাঁহার পক্ষে অনিত্য বস্তু ত্যাগ করিয়া নিত্যবস্তু-লাভের চেষ্টা শুধু স্বাভাবিক নয়, অপরিহার্যও বটে। মুক্তিশাস্ত্রে বৈরাগ্যের অসংখ্য প্রকারভেদ বর্ণিত আছে, যথা—পর অপর তীব্র মধ্য মন্দ যতমান ব্যতিরেক একেন্দ্রিয় ইত্যাদি। যাঁহার বিবিদিষা অতি তীব্র, তিনি বৃদ্ধ বয়সে শ্রীভগবানে মন দিবার আশায় সারা জীবন আশ্রম-ধর্মের ভোগানুষ্ঠানে কি করিয়া রত থাকিবেন? "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোকঃ" যাঁহার ভাব, তাঁহার

পক্ষে "বৃদ্ধ বয়সে বানপ্রস্থের আহ্বানে ব্রহ্মানুভূতির মধ্যে ডুব দিবার" জন্য সারা জীবন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা নিতান্তই অসম্ভব। জীবনের সায়াহ্নে অবসন্ন ভগ্ন দেহ ও নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম লইয়া সংসার হইতে অবসরপ্রাপ্ত জীবন যাপন করামাত্রই সার হয়, তখন ব্রহ্মানুভূতির মধ্যে ডুব দিবার সঙ্কল্প আকাশ-কুসুম! ইহা প্রচ্ছন্ন ভোগেচ্ছার অভিব্যক্তি মাত্র। পাতঞ্জল দর্শন বলেন, "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ (সমাধিলাভঃ)"—'তীব্র সংবেগশালী বা বৈরাগ্যবান্ যোগীদের সমাধিলাভ আসন্ন হইয়া থাকে।' বৈরাগ্যের কোন কালাকাল নাই। এইজন্যই "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"—'যখনই বৈরাগ্যের উদয় হইবে, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে।' শাস্ত্রকারগণ বাল্য যৌবন সকল সময়ই সন্ন্যাসগ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠে আছে—"যুবৈব ধর্মশীলঃ স্যাৎ"—'ধর্মলাভের জন্য বাল্য এবং যৌবনই প্রশস্ত সময়।' "আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ" ব্যক্তিই ধর্মলাভের যোগ্য। সমগ্র উপনিষৎ সমস্বরে বলিতেছেন—"ন কর্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"—'কর্ম পুত্র বা ধন দ্বারা নয়, ত্যাগ ভিন্ন অমৃতত্ব লাভ অসম্ভব'। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিয়াছেন যে, যাঁহারা কালাকাল-বিচার না করিয়া ঈশ্বর-লাভ করিতে যথার্থই ব্যাকুল, ত্যাগই তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র উপায়।

জগতের প্রধান প্রধান সকল ধর্মমতই ঈশ্বর-লাভের জন্য নিবৃত্তি বা ত্যাগের মাহাত্ম্য-কীর্তনে পূর্ণ। মনু বলিয়াছেন, "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" ঈশদূত যিশুখৃষ্ট উপদেশ দিয়াছেন, 'তোমার সর্বস্ব দরিদ্রকে দান করিয়া আমার অনুসরণ কর।' রাম কৃষ্ণ মহাবীর বুদ্ধ শঙ্কর রামানুজ গৌরাঙ্গ জরথুষ্ট্র খৃষ্ট নানক কবীর লাউজে এবং কংফুস্ প্রভৃতি মহাপুরুষ ঈশ্বর-লাভার্থ ত্যাগের মহিমা-প্রচারে পঞ্চমুখ। এই অতিমানবগণ-প্রবর্তিত সম্প্রদায়সমূহে কোন-না-কোন আকারে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী বর্তমান। সকল ধর্মমতেই সংযমশূন্য ভোগবাদ শত-ভাবে নিন্দিত এবং ঈশ্বরলাভার্থ ত্যাগ বা নিবৃত্তি উচ্চ-প্রশংসিত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ধর্মভূমি ভারতবর্ষই ঈশ্বরলাভের জন্য ত্যাগ-মাহাত্ম্য সমধিক প্রচার করিয়াছে এবং এই ত্যাগধর্মই শত শত প্রলয়ঙ্কর বিপ্লবের মধ্যে ভারতবর্ষকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "জগতের সকল জাতি দুইটি বড় বড় সমস্যা-সমাধানে নিযুক্ত। ভারত উহার মধ্যে একটির মীমাংসায় এবং জগতের অন্যান্য সকল জাতি অপর-টির মীমাংসায় নিযুক্ত। এখন প্রশ্ন—এই দুই পথের মধ্যে কোন্‌টি জয়ী হইবে? কিসে জাতিবিশেষ দীর্ঘ জীবন লাভ করে, কিসেই বা অপর জাতি অতি শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়? জীবন-সংগ্রামে প্রেমের জয় হইবে, না ঘৃণার জয়

হইবে ? ভোগের জয় হইবে, না ত্যাগের জয় হইবে ? জড় জয়ী হইবে, না চৈতন্য জয়ী হইবে ? * * ইন্দ্রিয়সুখের বাসনাত্যাগী জাতিই দীর্ঘজীবী হইতে পারে। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ দেখ—ইতিহাস আজ প্রতি শতাব্দীতেই অসংখ্য নূতন নূতন জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের কথা আমাদিগকে জানাইতেছে, শূন্য হইতে উহাদের উদ্ভব—কিছুদিনের জন্য পাপখেলা খেলিয়া আবার তাহারা শূন্যে বিলীন হইতেছে। কিন্তু এই মহান্ জাতি অনেক দুরদৃষ্ট বিপদ এবং দুঃখের ভার সত্ত্বেও (যাহা জগতের অপর জাতির মস্তকে পড়ে নাই) এখনও জীবিত রহিয়াছে। কারণ, এই জাতি ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছে, আর ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম্ম কি করিয়া থাকিতে পারে ?

"নানাবিধ মতমতান্তরের বিভিন্ন সুরে ভারত-গগন প্রতিধ্বনিত হইতেছে সত্য, কোন সুর ঠিক তালে-মানে বাজিতেছে, কোনটি বা বেতালা বটে, কিন্তু বেশ বোঝা যাইতেছে, উহাদের মধ্যে একটি প্রধান সুর যেন ভৈরব-রাগে সপ্তমে উঠিয়া অপরগুলিকে আর শ্রুতিবিবরে পঁহুছিতে দিতেছে না। ত্যাগের ভৈরব-রাগের নিকট অন্যান্য রাগ-রাগিণী যেন লজ্জায় মুখ লুকাইতেছে। * * অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে, কিরূপে দল-গঠন ও পরিচালন

করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক লাভ করিতে হয়, তাহা শিখিতে হইবে। ত্যাগ আমাদের লক্ষ্য হইলেও যতদিন না দেশ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগে সমর্থ হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ পাশ্চাত্ত্যাদি জাতির নিকট ঐ সকল বিষয় শিখিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত—ত্যাগই আমাদের আদর্শ। * * পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যতই চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন,—উহা যতই অদ্ভুত ব্যাপারসমূহ প্রদর্শন করুক না কেন,—আমি এই সভায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, ওসব মিথ্যা, ভ্রান্তি—ভ্রান্তিমাত্র। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আত্মাই একমাত্র সত্য, ধর্ম্মই একমাত্র সত্য। ঐ সত্যকে ধরিয়া থাক।

"কেবল ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে, ত্যাগই মহাশক্তি। * * ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা; ঐ পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া যে-সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে—সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার, সর্ব্বপ্রকার অসাধুতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে, আর যেন বলিতেছে, সাবধান, ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে। হিন্দুগণ, ঐ ত্যাগের পতাকাকে পরিত্যাগ করিও না—উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধর।"

অপর দিকে দেখা যাইতেছে—সন্ন্যাস বা মোক্ষধর্মের পক্ষ হইতে অসংযত ভোগের বিরুদ্ধে প্রচার-সত্ত্বেও জগতের সর্বত্র পৌনে ষোল আনারও অধিক লোক ভোগপথে জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, এবং ইহাই স্বাভাবিক। কারণ, সাধারণ মানুষের শরীর মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতির স্বাভাবিক তৃষ্ণাই ভোগলক্ষ্যে প্রধাবিত। হিন্দুশাস্ত্র এক শ্রেণীর অতি মুষ্টিমেয় লোককে মোক্ষ-মার্গে প্রবুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য একদিকে যেমন ত্যাগের গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন, অপর দিকে বর্ণাশ্রম-ধর্মাবলম্বী সর্বসাধারণের জন্য তেমন ভোগের মাহাত্ম্য-কীর্তনেও কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্তব্য পালন না করিলে শাস্ত্রকারগণ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন। যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্"—'শত্রুগণকে জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর।' মহানির্বাণ-তন্ত্র গৃহস্থকে "যত্নপূর্বক বিদ্যা ধন যশঃ ধর্ম উপার্জন করিয়া আহার-নিদ্রাদি পরিমিতভাবে করিতে এবং শত্রুর সমক্ষে শূরভাবাপন্ন হইতে" বিশেষ জোরের সহিত উপদেশ দিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রবিহিত যাগযজ্ঞ দেবদেবী-অর্চনা ব্রত প্রায়শ্চিত্ত দশবিধ-সংস্কার প্রমুখ সকল অনুষ্ঠানই প্রধানতঃ ভোগ বা প্রবৃত্তি-

ধর্মমূলক। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীভক্ত প্রার্থনা করিতেছেন— "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।" পুরাণ সংহিতা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ভোগধর্মের মাহাত্ম্য-কীর্তনে মুখরিত। ভোগবাসনা থাকাসত্ত্বেও উহা চরিতার্থ করিতে অসামর্থ্য-জনিত নিবৃত্তি 'ত্যাগ'-পদবাচ্য নহে! ভিক্ষুক আবার কি ত্যাগ করিবে? জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মর্কট-বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া ভিক্ষান্নে জীবন-ধারণ হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষভাবে নিন্দিত। ভোগের উর্বর ক্ষেত্রেই ত্যাগের ফসল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইতিহাস-পাঠে জানা যায়—রামায়ণ এবং মহাভারতোক্ত প্রাচীন রাজবংশের অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যেই সনক সনাতন যাজ্ঞবল্ক্য জমদগ্নি ভরদ্বাজ ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি বিশ্বামিত্র প্রমুখ ঋষির উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর রাজচক্রবর্তী অশোকের মহাবৈভবের মধ্যেই ভগবান্ শ্রীবুদ্ধের মহাত্যাগধর্ম অর্ধ-পৃথিবীতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। মৌর্য সুঙ্গ গুপ্ত পল্লব চোল পাণ্ড্য চালুক্য প্রভৃতি স্বাধীন হিন্দুরাজবংশের অনুপম ভোগৈশ্বর্যের মধ্যেই শত শত কারুকার্যমণ্ডিত মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত এবং বিশিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক ও দার্শনিক আচার্যগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ততটা আবশ্যক না হইলেও কোন দেশ বা জাতির সর্বাঙ্গীণ

মস্তক অবনত। বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব ভোগের বিজয়-দুন্দুভিনিনাদে মুখরিত হইলেও মহৎ উদ্দেশ্যে ত্যাগ সর্বত্র সম্মানিত। এযুগেও ধর্ম দেশ জাতি ও পরার্থে যেখানে যত বেশী ত্যাগ, সেইখানে জগৎশুদ্ধ লোকের তত অধিক করতালি। মানব-সমাজের মহত্ত্ব ও পূর্ণত্ববিধানের জন্য অধিকারি-ভেদে দুইটিই অপরিহরণীয়। যতদিন আলোক-অন্ধকার জগতে থাকিবে, ততদিন ত্যাগ ও ভোগ অধিকারভেদে পাশাপাশি চলিবে। যাঁহারা মনে করেন—দুনিয়াশুদ্ধ ত্যাগের পথে চলিলে ভোগের ধর্ম অচল হইবে, তাঁহারা ভ্রান্ত। সৃষ্টির সময় হইতে আজ পর্যন্তও জগতে ত্যাগের পতাকা উন্নত শীর্ষে উড়িতেছে, কিন্তু সকল কালেই অতি মুষ্টিমেয় লোক উহার নিম্নে সমবেত। প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রেরণাপূর্ণ জগতে নিবৃত্তির পথ চিরকালই ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম; সুতরাং এ পথে সকল কালেই অতি অল্পসংখ্যক লোক বিচরণ করেন। পক্ষান্তরে, দেশশুদ্ধ লোক যদি ত্যাগের পথে যথার্থই ধাবিত হয়, তাহা হইলে ভোগ লোককল্যাণকর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবে। সাধারণের পক্ষে সুসংযত ভোগ আবশ্যক, এবং অসংযত উচ্ছৃঙ্খল ভোগ বর্জনীয়। দেখা যাইতেছে যে, উচ্ছৃঙ্খল ভোগের আতিশয্যে

যেমন পাশ্চাত্ত্য মরিতে বসিয়াছে, ভারতের জনসাধারণ তেমন ভোগের ঐকান্তিক অভাবে মৃতকল্প। ইহার প্রতিকারের উপায়রূপে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যকে প্রাচ্যের সত্ত্বগুণ বা ত্যাগসংযমাদি এবং প্রাচ্যকে পাশ্চাত্ত্যের রজোগুণ বা ভোগাদি গ্রহণ করিতে বিশেষ জোরের সহিত উপদেশ দিয়াছেন।

বিভিন্ন শক্তির সঙ্ঘাতেই জগতের বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। বিরুদ্ধশক্তিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্বই সৃষ্টির উপাদান। ত্যাগ-ভোগের ন্যায় অস্তি-নাস্তি আলোক-অন্ধকার রৌদ্র-বৃষ্টি জীবন-মৃত্যু জ্ঞান-অজ্ঞান স্বর্গ-নরক ভাল-মন্দ শান্তি-অশান্তি সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—একটি ভিন্ন অপরটির অস্তিত্ব—এমন কি কল্পনাও সম্ভব নয়। কি প্রাণি-জগতে কি জড়জগতে সর্বত্রই দুইটি বিরুদ্ধশক্তির দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। তথাপি জগতের গতি এমন বিচিত্র যে, প্রত্যেক মানুষই আপন আপন ভাবানুযায়ী একটিকে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া অপরটি পরিপূর্ণরূপে লাভ করিতে সচেষ্ট। ইহারই নাম জীবন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে নানা বিষয়ে অপূর্ণ দেখিয়া প্রত্যেক মানুষ আপন আপন শিক্ষা ও ভাবের অনুপাতে সকল বিষয়ে পূর্ণ এক জগতে বাস করিতে আগ্রহান্বিত। জগতের সকল ধর্ম সমস্বরে বলেন,

'এই জীবভাবপ্রাপ্ত অবস্থা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়; মানুষ ছিল ভাল, এই পৃথিবীতে আসিয়া হইয়াছে মন্দ, অথবা মন্দ কিছু কোন আকারে তাহার মধ্যে ছিল বলিয়াই তাহাকে এই পৃথিবীতে আসিতে হইয়াছে। তাহাকে যাইতে হইবে ফিরিয়া আবার তাহার স্বধামে —স্বস্বরূপে।' এই অবস্থা-লাভের জন্য অজ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া জ্ঞান, মন্দ ত্যাগ করিয়া ভাল, পাপকে ত্যাগ করিয়া পুণ্য, অসম্পূর্ণতাকে ত্যাগ করিয়া পূর্ণতা, মৃত্যুকে ত্যাগ করিয়া অমরত্ব, অসত্যকে ত্যাগ করিয়া সত্য এবং অস্বাভাবিক অবস্থাকে ত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় যাইতে সকল ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র উপদেশ দান করেন। যাঁহারা কোন ধর্ম বা নীতি মানেন না, তাঁহারাও মানুষকে ইহজীবনেই তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত এক পূর্ণত্ব দান করিতে চেষ্টিত। ভোগের চরম লক্ষ্যও এই পূর্ণত্বলাভ—যে অবস্থায় উপনীত হইলে আর কোন কিছু লাভ করিবার অবশিষ্ট থাকে না।

হিন্দুশাস্ত্র বলেন, "বাসনাক্ষয় ও তত্ত্বজ্ঞান পরস্পরের কারণ।" ত্যাগধর্মী নিবৃত্তি-পথে সর্ববাসনামুক্ত হন, ভোগধর্মীও প্রবৃত্তিপথাশ্রয়ে ভোগের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া সকল বাসনার পারে যাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভোগের শেষ-সীমায় যাইয়া সর্ববাসনা-নির্মুক্তি এই সতত পরিবর্তনশীল

ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবনে সম্ভব নয় বলিয়াই পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্র ত্যাগের উপর গুরুত্ব-প্রদান করিয়াছেন। একমাত্র অধিকারভেদই উভয় পথ-নির্ণয়ের মানদণ্ড। ভোগেচ্ছা থাকিতে ত্যাগ এবং মুমুক্ষুর পক্ষে ভোগ উভয়ই অসম্ভব। একের ঔষধ অপরের পক্ষে বিষতুল্য, একের ধর্ম অপরের বিরুদ্ধ। অধিকারভেদে ত্যাগ ও ভোগ উভয় পথে মানুষ চলিবেই। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ এই দুইটি আপাত-বিরোধী শক্তিকে জগতের হিতার্থে অধিকারভেদে বিভিন্ন পথে মহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালন করিয়া বিশ্বমানবের সকল সমস্যা-সমাধানের উপায় দেখাইয়াছেন।

রজোগুণের উদ্দীপনায়

স্বামী বিবেকানন্দ

হিন্দুশাস্ত্রমতে যিনি স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর হইতে বিলক্ষণ, পঞ্চকোষ হইতে ভিন্ন, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার সাক্ষী, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তিনিই আত্মা। প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ অবিকারী দেহী বা আত্মার স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এইজন্য আত্মা গুণাতীত হইয়াও নাম-রূপের মরীচিকায় পতিত হইয়া জীবভাবপ্রাপ্ত। আত্মা-সম্বন্ধে গীতা বলেন, "যিনি ভূতসমূহে পৃথক্ পৃথক্ অথচ অখণ্ড চৈতন্যরূপেও বিদ্যমান এবং যিনি নিত্যমুক্ত হইয়াও জীবে জীবে বদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন, তিনিই আত্মা।" অন্যত্র—"মহাপ্রলয়কালীন

জলরাশির ন্যায় আত্মা বিশ্ব ভরিয়া রহিয়াছেন।" একমাত্র বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের পূর্ণবিকাশেই জীবাত্মার এই সর্বগত ব্রহ্মস্বরূপ মানুষের জ্ঞানগম্য হইতে পারে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যে জ্ঞান দ্বারা মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিসমূহে অভিন্ন অব্যয় এক আত্মাকেই সন্দর্শন করেন, তাহাই বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জ্ঞান।" এই শুদ্ধসত্ত্বগুণে মানুষকে স্থিত করাই সকল ধর্মের মূল কথা। সত্ত্বগুণের লক্ষণ—প্রকাশশীলতা জ্ঞান ও শান্তভাবস্থিতি। রজোগুণের কার্য্য—বিষয়তৃষ্ণাসমুদ্ভূত কর্মপ্রবণতা ভোগবাসনা ও অবিরতি। আর তমোগুণের ধর্ম—কর্মহীনতা আলস্য অজ্ঞান ভয় ও নিদ্রা। রজঃ ও তমকে পরাভূত করিয়া পূর্ণ সত্ত্বগুণে স্থিত হইলে আত্মা নিজ মহিমায় স্বতঃ প্রকাশিত হন, কিন্তু তমোবর্জিত হইয়া রজোগুণের সাহায্য ভিন্ন সত্ত্বে উপনীত হইবার উপায় নাই।

সত্ত্বগুণ হইতেও সর্বগুণাতীত অবস্থা শ্রেষ্ঠ বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে চরাচর বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। বিকার বা গুণসমূহ প্রকৃতিজাত। পুরুষ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতিসঞ্জাত রূপরসাদি ভোগ করেন। এই ভোগাসক্তিই পুনঃ পুনঃ জন্মের কারণ। কিন্তু 'আকাশ সর্বগত হইয়াও যেমন কোন বস্তুর সহিত লিপ্ত নহে, পুরুষ বা আত্মা সকল দেহে

অবস্থান করিয়াও তেমন কোন শরীরের সঙ্গে মিশ্রিত হন না।' পুরুষ নিষ্ক্রিয় হইয়াও সর্ববস্তুর ধারণকর্তা, তিনি নির্গুণ হইয়াও সকল গুণের সংরক্ষক। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ"—'প্রকৃতি দ্বারা ক্রিয়মাণ হইয়া গুণই সকল কর্ম করিতেছে,' আত্মা কিছুই করেন না, তিনি নির্লিপ্ত সাক্ষিস্বরূপ, এই প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়া সাধক আত্মস্বরূপ জানিয়া গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই অবস্থায় উপনীত হওয়াই মানব-জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। কিন্তু কেবল গুণের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াই এই গুণাতীত অবস্থায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব। এজন্য একমাত্র উপায় —প্রথমতঃ রজোগুণরূপ কাঁটাদ্বারা তমোরূপ কাঁটা তুলিতে হইবে, পরে রজোরূপ দেহবিদ্ধ কাঁটাটিকেও সত্ত্বগুণরূপ কাঁটার সাহায্যে তুলিয়া শেষে তিনটি কাঁটাকেই দূরে নিক্ষেপ করিয়া ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে। তিনটিই শৃঙ্খল—একটি লোহার, একটি রূপার এবং একটি সোনার। "গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্। জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে"—'দেহী দেহজাত এই তিনটি গুণকে অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যু-জরাদুঃখবর্জিত হইয়া অমৃতত্বপ্রাপ্ত হন।'

মানুষ যখন তাহার জন্মগত সর্ববিধ জ্ঞান শক্তি

ও পবিত্রতার প্রস্রবণ আত্মাকে আপনার মধ্যে সন্দর্শন করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহার পক্ষে প্রথমতঃ সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরে গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইবার ঐকান্তিক আগ্রহ অদম্য হইয়া থাকে। এইরূপে আত্মাকে প্রত্যক্ষানুভব করিবার তীব্র সংকল্পের নাম মুমুক্ষুত্ব। এই মুমুক্ষা ভিন্ন কাহারও আত্মদর্শন অসম্ভব, আর এই দর্শন কেবল তমোবর্জিত রজোগুণের সাহায্যেই সম্ভব। সুতরাং কাহারও মনে মহারজোগুণাত্মক কর্মপ্রেরণা না আসিলে সত্ত্বগুণ তাহার পক্ষে অর্থহীন শব্দমাত্র। জগতের ধর্মাচার্যগণ অক্লান্ত কর্মের ভিতর দিয়াই গুণাতীত অবস্থা লাভ করিয়াছেন। অবশ্য জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ বহুধা নিন্দিত এবং শাস্ত্রমতে জ্ঞানোৎকর্ষপরায়ণ পুরুষের কর্মে অবসর নাই সত্য, কিন্তু ইহাও গীতা বলেন যে, "মানুষ কর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কর্মহীন অবস্থা লাভ করিতে পারে না। কর্ম ছাড়িয়া কেহ সিদ্ধিলাভও করিতে পারে না।" এই মহৎ শাস্ত্র-মতে কর্মযোগ ঈশ্বরলাভের একটি পথ। স্বামী বিবেকানন্দও কর্মযোগকে মুক্তিলাভের অন্যতম উপায় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

বৌদ্ধযুগে সমগ্র ভারতকে নির্বাণ-মোক্ষকামী সন্ন্যাসীদের মঠে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। দেশের সকলে যদি মোক্ষমার্গের ঠিক ঠিক অনুসরণ করিত, তাহা হইলে পরম কল্যাণ সাধিত হইত। কারণ, আত্মস্বরূপ জানিয়া সর্ববন্ধন-

মুক্ত হওয়া অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ মানুষের আর কি হইতে পারে? কিন্তু তাহা নিতান্তই অসম্ভব, মুক্তির পথ নিশিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম; সুতরাং এই অবস্থালাভ অতি অল্প-সংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। ভোগ-বিলাসপূর্ণ জগতে সতেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম লইয়া নিবৃত্তি-মার্গ বা সত্ত্বগুণের পথ অতি মুষ্টিমেয় লোকেরই গ্রহণযোগ্য। বর্তমানে দেখা যায়, দেশশুদ্ধ সকলে—অন্ততঃ অধিকাংশ হিন্দু আপনাদিগকে সত্ত্বগুণী মনে করেন, কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখা যায়, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনের সত্ত্বগুণ দূরের কথা, কিছুমাত্র কর্মশক্তি বা রজোগুণেরও বিকাশ নাই, প্রায় সকলেই ঘোর তমে আকণ্ঠ মজ্জমান! সেই বৌদ্ধধর্মের পতনের যুগের "কর্মকুণ্ঠ লোকদেখানো মুক্তিকাম" সত্ত্বগুণের নামে সমগ্র হিন্দুজাতিকে আজও প্রতারণা করিতেছে। গোটা ভারত মহা-তমে আচ্ছন্ন! কেবল উদরান্নের জন্য অগণিত জনসঙ্ঘের হাহাকারে যে দেশের আকাশ-বাতাস বিষাক্ত, যে দেশে দারিদ্র্য নগ্নমূর্তি ধারণ করিয়া সমগ্র জাতিকে জগতের ঘৃণার পাত্র করিয়া রাখিয়াছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ পরিবার বাধ্য হইয়া গরু-ঘোড়ার সঙ্গে একত্র জীবন যাপন করিতেছে, অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে যে দেশের লোক জানোয়ারের মত জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেছে, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—"যেখানে মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত

করিতে চাহে,—যেখানে জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্ম্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করে, যেখানে ক্রূরকর্ম্মা তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকে ধর্ম্ম করিয়া তুলে—যেথায় নিজের সমর্থতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ, * * সে দেশ যে তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই ?" দেশের এই হৃদয়-বিদারক করুণ দৃশ্য দর্শন করিয়া মুক্তপুরুষ স্বামীজি দেশভক্তরূপে পরিণত হইয়া উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন, "মহারজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন এখন তোদের না আছে ইহকাল—না আছে পরকাল। দেশ ঘোর তমতে ছেয়ে ফেলেছে। ফলও তাই হচ্ছে—ইহজীবনে দাসত্ব—পরলোকে নরক'। * * তাই বলছি, এখন মানুষকে রজোগুণে উদ্দীপিত করে কর্ম্মপ্রাণ করতে হবে। কর্ম্ম কর্ম্ম কর্ম্ম, এখন আর "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়,"—'উহা ভিন্ন উদ্ধারের আর পথ নাই'।"

প্রকৃতির বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিজ জীবন রক্ষার চেষ্টা প্রাণি-জগতের সাধারণ ধর্ম। জীবন-ধারণের জন্য সকলের আগে দরকার—'অন্ন-সংস্থান'। যে মানুষের পক্ষে মোটা ভাত এবং মোটা কাপড় সংগ্রহ করাই ভীষণ সমস্যা, তাহার মন উদরের চিন্তাকে অতিক্রম করিয়া ধর্ম দর্শন সাহিত্য শিল্প ভাস্কর্য ললিতকলা দেশসেবা প্রভৃতি বিষয়ক উচ্চচিন্তা ও উচ্চকর্মে নিয়োজিত হইতে পারে না। স্বামীজির

উদ্দেশ্য ছিল এই উন্নত বিষয়গুলি জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে আপামর সাধারণের মধ্যে বিস্তার। কিন্তু ইহকালে যে একমুষ্টি উদরান্ন-সংস্থানে অপারক, পরকালের পথ—স্বর্গের রাস্তা বা ঐ সকল উন্নত বিষয়ের সন্ধান করিতে তাহাকে পরামর্শ দেওয়া কি তাহার পক্ষে বিদ্রূপের কথা নয়? এইজন্য স্বামীজি তাঁহার বুভুক্ষু দেশবাসীকে সর্বাগ্রে অন্ন-বস্ত্র-সংস্থান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেও যেখানে ভাতের অভাব, সেখানে গীতা অপেক্ষা ভাতের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। সমস্ত দেশ যে দুরবস্থার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। দেশে ঘরে ঘরে অশন-বসনের নিত্যদুর্ভিক্ষ; হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক ভিক্ষুকের মত দেশময় কর্মসন্ধানে বিচরণ করিতেছে, সংখ্যাতীত সর্বহারা বাস্তত্যাগী-দের আগমনে ইহাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে; কাজ নাই, কাজের ক্ষেত্র নাই, কাজ দিবার লোক নাই। দেশে ম্যালেরিয়া কলেরা ও বসন্তের আধিপত্য এবং সমাজে অশিক্ষা অস্পৃশ্যতা সাম্প্রদায়িকতা ও কুসংস্কারের রাজত্ব; এই সকল অনর্থের মধ্যে কি আর ধর্ম বা সত্ত্বগুণের প্রবেশাধিকার আছে? এ যে মহাতমের কুজ্ঝটিকায় জীবনের চারিদিক ঘনায়মান অন্ধকার!

এই দুরবস্থা-প্রতিকারের উপায়-স্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিয়াছেন, "যাহা আমাদের নাই, বোধ

হয় পূর্ব্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দন ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতির তৃষ্ণা, চাই—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি, চাই—আপাদ-মস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।" অন্যত্র—"আমি এদের ভিতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্ম্মতৎপরতার দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করিতে চাই। * * সকলকে ধরে ধরে বলগে, তোমরা অমিতবীর্য্য—অমৃতের অধিকারী। এইরূপে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর,—জীবন-সংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর, তারপর পরজীবনে মুক্তিলাভের কথা তাদের বল। * * ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব, পাশ্চাত্ত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্ত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিম্ন-স্তরের তমোগুণকে পরাহত করিয়া পাশ্চাত্ত্যের রজোগুণ-প্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণেরও বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।" যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের এই নির্দেশ-অনুসারে প্রবল রজোগুণের উদ্দীপনায় মহা-তামসিকতায় মগ্ন আপামর জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই ভারতের জাতীয় উন্নতির অন্যতম উপায়।

‘অহিংসা’-ব্যাখ্যায়
স্বামী বিবেকানন্দ

কায়মনোবাক্যে কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট-সাধন বা কাহাকেও কোন ভাবে হিংসা না করাই অহিংসা। ইহা মানুষের অত্যুন্নত মানসিক বৃত্তি এবং সকল ধর্ম ও নীতির ভিত্তি। পৃথিবীর সকল ধর্মপ্রবর্তক ও নীতিপ্রচারক মহাপুরুষই এই মহৎ গুণটির মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে হিংসারূপ পশুভাব সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া অহিংসারূপ দেবভাবে অধিষ্ঠিত হওয়াই মানব-জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ।

এই মহৎ আদর্শে উপনীত হইতে হইলে মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটি গুণের অনুশীলন করা আবশ্যক। সকল ভূতের প্রতি বৈরিতা একেবারে ত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রতি আন্তরিক মৈত্রীভাব পোষণ করা অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত

হইবার প্রধান উপায়। যিনি সকল ভূতকে আপনারই আত্মার বহুরূপ বলিয়া প্রত্যক্ষ দেখেন এবং অন্তরে বাহিরে ব্রহ্ম বা নারায়ণের অবস্থিতি সন্দর্শন করেন, তিনি—কেবলমাত্র সেই মহাত্মাই এই দেবদুর্লভ অবস্থা লাভ করিতে পারেন। অদ্বৈত বা অভেদ-ভাবমূলে সর্বভূতে সমদর্শন না হইলে যথার্থ মৈত্রী-ভাবে অধিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। মনে দ্বৈতবুদ্ধি বা ভেদজ্ঞান-সঞ্জাত অসমভাবের লেশমাত্র থাকা পর্যন্ত মৈত্রীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

মৈত্রীর অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে মানুষের অন্তর করুণায় আপনা-আপনি ভরপুর হইয়া থাকে। কেহ জগতের সকল নরনারীকেই যথার্থ মিত্র মনে করিলে তাঁহার পক্ষে তাহাদের সুখদুঃখকে আপনার সুখদুঃখ বলিয়া মনে করাই অত্যন্ত স্বাভাবিক নহে কি? সুতরাং করুণার আবির্ভাব না হইলে নিশ্চিত বুঝিতে হইবে যে, মৈত্রী আবির্ভূত হয় নাই। যাঁহার মনে যথার্থ করুণার উদয় হয়, তিনি সকল মানুষের প্রতি—এমন কি তাঁহার অনিষ্টকারীর প্রতিও করুণা প্রকাশ করেন। এইজন্য মৈত্রীভাব-সঞ্জাত করুণা অহিংসার অমৃতপ্রসূ ফল।

মুদিতা অর্থাৎ সকল সৎকর্মে একই প্রকার আনন্দবোধ মৈত্রীভাবের আর একটি লক্ষণ। দেখা যায়—একই সৎকর্ম স্বকৃত হইলে মানুষের যে আনন্দবোধ হয়, আত্মীয়-স্বজনকৃত হইলে তাহার তত আনন্দ অনুভূত হয় না। এইরূপে সৎকর্ম-

কারীর সহিত সম্পর্ক যতই দূরবর্তী হয়, তাহার আনন্দের মাত্রাও ততই কমিতে থাকে, শেষে দূরবর্তী স্থানে সম্পর্কহীন অপরিচিত ব্যক্তিদের অনুষ্ঠিত সৎকর্মে সাধারণতঃ মানুষ কোন আনন্দই বোধ করে না। সকলের প্রতি মৈত্রীভাবের অভাবে এবং মনে হিংসা লুক্কায়িত থাকে বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়। নিজকৃত এবং পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিদের কৃত একই সৎকর্মে যাঁহার একই প্রকার আনন্দবোধ হয়, তিনিই প্রকৃত অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত।

অসৎকর্ম ও উহার অনুষ্ঠানকারীর প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা-প্রদর্শন মৈত্রীভাব-সাধনার অপর একটি উপায়। দেখা যায় —অসৎকর্ম ও উহার অনুষ্ঠাতার বিরুদ্ধে সাধারণ সৎ মানুষের মনও বিদ্রোহী হইয়া থাকে, এবং ইহার প্রতিকার-প্রবৃত্তি তাঁহার চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট করে। তিনি যদি মনে করেন—যে অবস্থার তাড়নায় অসৎকর্মটি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি ঐ অবস্থায় পড়িলে উহা অপেক্ষা অধিকতর অসৎকর্ম করিতেন, তাহা হইলে অসৎকর্ম ও অসৎকর্মকারীর প্রতি ঘৃণা এবং উহার প্রতিকারচিন্তা-জনিত অশান্তি হইতে তিনি রক্ষা পাইবেন। বিশ্লেষণ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, অন্তর্নিহিত হিংসাই এই অশান্তির কারণ। যিনি অহিংসায় অধিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছুক তাঁহার জানা উচিত যে, এই সদসৎ-মিশ্রিত জগতে সৎ ও অসৎ উভয়ই চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। কেহ প্রাণপণে

চেষ্টা করিয়াও সকলের কৃত অসৎকর্ম হইতে জগৎকে কোন কালেও মুক্ত করিতে পারিবেন না। এরূপ অবস্থায় কেহ নিয়ত অসৎকর্মের প্রতিকারের উপায় লইয়া মাথা ঘামাইলে তাহার মনে অশান্তি বাড়িতেই থাকিবে। কাজেই অসৎকর্মের প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শনই চিত্তের স্থৈর্য রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়। যিনি চিত্তবৃত্তিগুলিকে শান্ত করিয়া অহিংসায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে অভিলাষী, সেই মহাত্মার পক্ষে অসৎকর্মের প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই! যোগিগণ বলেন, আমাদের মনের অসৎকার্যের প্রতি ঘৃণা অথবা উহার প্রতিকার-প্রবৃত্তিরূপ প্রতিক্রিয়া শক্তির অপচয়মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "কোন অশুভ চিন্তা অথবা ঘৃণাপ্রসূত কার্য্য অথবা কোন প্রকার প্রতিক্রিয়ার চিন্তা যদি দমন করা যায়, তবে তাহা হইতে শুভকরী শক্তি উৎপন্ন হইয়া আমাদের উপকারার্থ সঞ্চিত থাকিবে। এইরূপ সংযমের দ্বারা আমাদের যে কিছু ক্ষতি হয় তাহা নহে, বরং তাহা হইতে আশাতীত উপকার হইয়া থাকে। যখনই আমরা ঘৃণা অথবা ক্রোধ-বৃত্তিকে সংযত করি, তখনই উহা আমাদের শুভশক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে।" যিনি এই সকল ভাব জীবনে কার্যে পরিণত করেন তিনিই অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, এইরূপ ব্যক্তির নিকট

অপরে তাহার স্বাভাবিক বৈরিতা ত্যাগ করে। স্বামী বিবেকানন্দ এই সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যদি কোন ব্যক্তি অহিংসার চরমাবস্থা লাভ করেন, তবে তাঁহার সম্মুখে যে সকল প্রাণী স্বভাবতঃ হিংস্র, তাহারাও শান্ত ভাব ধারণ করে। সেই যোগীর সম্মুখে ব্যাঘ্র ও মেষশাবক একত্র ক্রীড়া করিবে,—পরস্পরকে হিংসা করিবে না। এই অবস্থালাভ হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তোমার অহিংসা-ব্রত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

অহিংসার এই লক্ষণসমূহ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কেবলমাত্র নিবৃত্তিপন্থী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষই সত্ত্বগুণের প্রাধান্যবশতঃ সম্পূর্ণভাবে অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ। রজঃ ও তমোগুণী প্রবৃত্তিপন্থীর পক্ষে অহিংসার অনুশীলন কেবল অহিংসার কতকগুলি নৈতিক নিয়মপালনের নামান্তরমাত্র।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে 'মোক্ষ' বা 'মুক্তি' অর্থ —"যা শেখায় যে ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই।" এই বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে তিনি লিখিয়াছেন, "এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ত এ লোকও নয়, পরলোকও নয়। তবে সে দাসত্ব লোহার শিকল আর সোনার শিকল। তার পর প্রকৃতির মধ্যে ব'লে বিনাশশীল সে সুখ থাকবে না। অতএব মুক্ত হতে

হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাহিরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না। এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই। * * এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্ত্তমান ছিলেন। বৌদ্ধদের পর হতে ধর্ম্মটা একেবারে অনাদৃত হল, খালি মোক্ষধর্ম্ম প্রধান হল।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "মোক্ষমার্গ প্রথম বেদই উপদেশ করেছেন। তারপর বুদ্ধই বল, আর যীশুই বল, সব ঐখান থেকে ত যা কিছু গ্রহণ। আচ্ছা, তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী,—'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'—বেশ কথা—উত্তম কথা। তবে জোর করে দুনিয়াশুদ্ধকে ঐ মোক্ষমার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন? ঘষে-মেজে রূপ, আর ধরে-বেঁধে পিরিত কি হয়? যে মানুষটা মোক্ষ চায় না, পাবার উপযুক্ত নয়, তার জন্য বুদ্ধ বা যীশু কি উপদেশ করেছেন বল, হয় মোক্ষ নয় তুমি উৎসন্ন যাও, এই দুই কথা। মোক্ষ ছাড়া যা কিছু করবে, সে আট-ঘাট তোমার বন্ধ। তুমি যে এ দুনিয়াটা একটু ভোগ করবে তার কোনও রাস্তা নাই, বরং প্রতিপদে বাধা। কেবল বৈদিক ধর্ম্মে এই চতুর্বর্গ-সাধনের উপায় আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

"ফল কথা, এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছো, ওটা ঐ ধর্ম্মের অভাব। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম্ম অনুশীলন করে, সে ত ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না; আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। নইলে খামকা দেশশুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল, না এদিক না ওদিক। যখন বৌদ্ধরাজ্যে এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্নে যাবার মুখে পড়েছে। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, জৈন, ওদের একটি ভ্রম যে, সকলের জন্য সেই এক আইন—এক নিয়ম। ঐটি মস্ত ভুল; জাতি ব্যক্তি ও প্রকৃতিভেদে শিক্ষা, ব্যবহার, নিয়ম সমস্ত আলাদা, জোর করে এক কর্ত্তে গেলে কি হবে?"

স্বামী বিবেকানন্দের মতে "ধর্ম্ম—অর্থ যা ইহলোকে বা পরলোকে সুখ-ভোগের প্রবৃত্তি দেয়।" তিনি লিখিয়াছেন, "ধর্ম্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।" তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে, এই ধর্মভাব পাশ্চাত্ত্য জাতির মধ্যে খুব প্রবল। এইজন্য তাহারা অত্যন্ত রজোগুণী। বর্তমানেও ভারতের অধিকাংশ হিন্দুনরনারী মহাতমে আকণ্ঠ মজ্জমান। তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগের প্রবল ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু রজোগুণের

অভাবে উহা কার্যে পরিণত করিতে তাহারা একেবারে অসমর্থ হইয়া সত্ত্বগুণের ভান করিয়া 'লোকদেখানো' মোক্ষ চাহিতেছে! বৌদ্ধপ্রভাববশতঃ অধিকারী ও অনধিকারী বিচার না করিয়া মোক্ষের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দানের জন্যই যে এরূপ হইতেছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে স্বামীজি লিখিয়াছেন, "বৌদ্ধরা বললে, 'মোক্ষের মত আর কি আছে, দুনিয়াশুদ্ধ মুক্তি নেবে চল', বলি তা কখনও হয়? তুমি গেরস্ত মানুষ, তোমার ওসব কথায় বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম্ম কর, এ কথা বলছেন হিঁদুর শাস্ত্র! ঠিক কথাই তাই। এক হাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে, কাজের কথা? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে একবুদ্ধি হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কাজ কর্ত্তে পার না—মোক্ষ নিতে দৌড়াচ্ছ!! হিন্দুশাস্ত্র বলছেন যে, 'ধর্ম্মের' চেয়ে 'মোক্ষটা' অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্ম্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত করে ফেললে আর কি? অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা; কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন, তুমি গেরস্ত, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনমায়ান্তং' ইত্যাদি,

হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নাই, মনু বলেছেন। এ সত্য কথা, এটি ভুলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য্য প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে, চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই! এটি শাস্ত্রের মত। সত্য সত্য, পরম সত্য, স্বধর্ম্ম করহে বাপু! অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করাও পাপ, গৃহস্থের পক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে হবে।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ধর্মকামী ইহলোকে ও পরলোকে সুখ চায় এবং মোক্ষকামী উভয় লোকের সুখ-দুঃখকে বন্ধন মনে করিয়া উহা হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছুক। উভয়ের আকাঙ্ক্ষা পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও অধিকার-ভেদে উভয়টিই ভাল। স্বামীজি লিখিয়াছেন, "'মুক্তিকামের' ভাল একরূপ, 'ধর্ম্মকামের' ভাল আর এক প্রকার, এই গীতা-প্রকাশক শ্রীভগবান্ এত করে বুঝিয়েছেন। এই মহাসত্যের উপর হিঁদুর স্বধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ইত্যাদি। 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ' ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য মোক্ষকামের জন্য। আর 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ', 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'

ইত্যাদি ধর্ম্মলাভের উপায় ভগবান্ দেখিয়েছেন। অবশ্য কর্ম্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলোই বা; উপোসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে—জড়ের চেয়ে ভালমন্দ-মিশ্রিত কর্ম্ম করা ভাল নয়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, আর দেয়ালই থাকে। মানুষ চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, আবার সেই মানুষ দেবতা হয়। সত্ত্বপ্রাধান্য-অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়—পরম ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভাল-মন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় হয়। * * সেই (সত্ত্বগুণপ্রধান) মহাপুরুষই 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ' ইত্যাদি। আর ঐ মিন্-মিনে পিন্-পিনে ঢোঁক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়া ন্যাতা, সাত দিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না, ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ! অর্জ্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই ত ভগবান্ এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়? প্রথমে ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ',—শেষে 'তস্মাত্ত্ব-মুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব।' ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরাও ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি—দেশশুদ্ধ

৯

পড়ে কতই 'হরি' বলছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান্ শুনছেনই না—আজ হাজার বৎসর। শুনবেনই বা কেন, আহাম্মকের কথা মানুষেই শুনে না—তা ভগবান্! এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগবদ্বাক্য শোনা—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'।" স্বামীজি অন্যত্র বলিয়াছেন, "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ—বৌদ্ধধর্ম্মের এই মত খুব ভাল, তবে অধিকারী বিচার না করে বলপূর্ব্বক রাজ-শাসনের দ্বারা ঐ মত ইতর-সাধারণ সকলের উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশের মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে। ফলে এই হয়েছে যে, লোকে পিঁপড়েকে চিনি দিচ্ছে, আব টাকার জন্য ভাইয়ের সর্ব্বনাশ সাধন কচ্ছে! এমন 'বকঃ পরমো ধার্ম্মিকঃ' এ জীবনে অনেক দেখেছি। অন্যপক্ষে দেখ—বৈদিক ও মনুক্ত ধর্ম্মে মৎস্য-মাংস খাবার বিধান রয়েছে, আবার অহিংসার কথাও আছে। অধিকারী বিশেষে হিংসা ও অধিকারী বিশেষে অহিংসাধর্ম্ম-পালনের ব্যবস্থা আছে।"

স্বামীজির উদ্ধৃত অভিমত হইতে স্পষ্ট যে, তিনি অতি উচ্চ কণ্ঠে অহিংসার প্রশংসা করিয়াও উহাকে অধিকার-ভেদে অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখে বীতস্পৃহ নিবৃত্তিপন্থী সত্ত্বগুণী সমদর্শী মোক্ষকামিগণের সাধন-সম্পদ্ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, আর ইহলোক

ও পরলোকে সুখভোগার্থী প্রবৃত্তিপন্থী রজোগুণী ভেদদর্শী ধর্মকামী গৃহস্থদিগকে অহিংসার উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া স্বধর্মপালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই উভয় শ্রেণীর পক্ষে স্বাভাবিক। হিন্দুশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা রামায়ণ মহাভারত পুরাণ সংহিতাদিতেও ইহার স্পষ্ট সমর্থন দেখা যায়। মহাভারতে আছে—অশ্বত্থামা প্রতারণা করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে। ইহাতে অর্জুন ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাজয় করেন, কিন্তু গুরুপুত্র বলিয়া তাহাকে হত্যা না করিয়া বন্দী করিয়া রাখেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ জানিয়া অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, 'আততায়ী যাহারাই হ'ক না কেন, তাহাদিগকে হত্যা করাই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। অশ্বত্থামা নির্দোষ শিশুগণকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। সে অতি জঘন্য ব্যক্তি, তাহাকে হত্যা করাই উচিত।" এইরূপ বহুশাস্ত্রপ্রমাণ-মূলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ বিষয়ে স্বামীজির উপদেশ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত।

প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, ইহলৌকিক ভোগসুখই জগতের অধিকাংশ নরনারীর প্রধান কাম্য। তাহারা আবশ্যক মত হিংসা অধর্ম অসত্য ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও এই কামনা চরিতার্থ করিতে বদ্ধপরিকর। বর্তমান

যুগে জীবিকার্জন সমস্যা-সংকুল হওয়ায় তাহাদের এই প্রচেষ্টা পূর্ব পূর্ব যুগ অপেক্ষা ক্রমেই অধিকতর উৎকট আকার ধারণ করিতেছে। ভোগ-সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা জিঘাংসায় বনের হিংস্র জন্তুরও অধম হইয়া পড়িতেছে। সকল হিংস্র প্রাণীর হিংস্রভাব চেষ্টা করিয়াও দূর করা যেমন সম্ভব নয়, সংসারে ভোগসুখার্থী সকল নরনারীর ভোগ-সুখের উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিয়া তাহাদিগকে যথার্থ অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত করাও তেমন অসম্ভব। অন্ততঃ পৃথিবীর এক শ্রেণীর নরনারী তাহাদের ভোগসুখ-পথের বিঘ্নগুলি প্রয়োজনের প্রেরণায় নানা ভাবে হিংসাসহায়েও দূর করিতে চেষ্টা করিবেই। তাহাদের এই দুষ্কার্য-প্রতিরোধের জন্যই পৃথিবীর সর্বত্র সর্বকালে আইন বিচারালয় পুলিস সৈন্য জেলখানা প্রভৃতি বিদ্যমান। এইগুলির আবশ্যকতা কোন কালেই একেবারে দূর হয় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতেও সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

কেহ কেহ বলেন, এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও ইদানীং ভারতবর্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে অহিংসা-নীতির প্রয়োগ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ইহার সত্যতা অনুসন্ধান করিলে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, কোন স্থানের জনসাধারণ কোন শক্তিমান্ পুরুষের অসাধারণ প্রভাবে

অকস্মাৎ ঠিক ঠিক অহিংস হওয়ার ফলেই যে উহা সম্ভব হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। সাধারণ মানুষের ন্যায়ই তখনও তাহাদের হিংসা ছিল এবং এখনও আছে, তবে তাহারা বিশেষ কোন কারণে যে উহা প্রয়োগ করে নাই, ইহাই সত্য। মনে হিংসা থাকা-সত্ত্বেও কোন কারণে বাহিরে উহার প্রয়োগ না করাই অহিংসা নহে। পক্ষান্তরে, কোন এক বা একাধিক বিষয়ে সমষ্টিগতভাবে অহিংসা-নীতির প্রয়োগ সফল হইলেই যে চারিদিকে হিংসার একচ্ছত্র রাজত্বের মধ্যে মানব-জীবনের সকল বিভাগে সর্বত্র সকল ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ সাফল্যমণ্ডিত হইবে, এরূপ আশা করা অযৌক্তিক। অবশ্য যথার্থ অহিংসা দ্বারা যে হিংসাকে জয় করা যায়, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ব্যক্তিগত-ভাবে অনেক মহাপুরুষ প্রকৃত অহিংসায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া হিংসাকে সম্পূর্ণ জয় করিয়াছেন এবং এই দেবমানবগণ মানব-জাতির আদর্শ। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে পৃথিবীর সকল দেশেরই অধিকাংশ নরনারী এখনও অহিংসার এলাকা হইতে বহুদূরে আছে। আবহমান কাল হইতে তাহারা ভোগ-সুখের প্রেরণায় হিংসা বিরোধ ও বিদ্বেষে মত্ত! অহিংসার অত্যুন্নত আদর্শগ্রহণে তাহারা একেবারেই অসমর্থ। বিশ্বময় প্রদীপ্ত হিংসার নিকট অহিংসা আজও নিষ্প্রভ। এ অবস্থায় যদি কোন স্থানের

মুষ্টিমেয় নরনারী ঠিক ঠিক অহিংসায় অধিষ্ঠিত না হইয়াও সাময়িক উত্তেজনাবশে উহার কাল্পনিক উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সংঘবদ্ধ আক্রমণাত্মক অত্যুগ্র হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-মূলক হিংসার প্রয়োগও না করে, তাহা হইলে তাহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য বাস্তববাদমূলক হিন্দুশাস্ত্রসমূহ ভোগসুখার্থী গৃহস্থদের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত তীব্র হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসার প্রয়োগ সমর্থন করেন নাই। পক্ষান্তরে, গৃহস্থ সর্ব-সাধারণের পক্ষে রাতারাতি অহিংসার অত্যুচ্চ আদর্শে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবও নহে। কারণ, ইহা দীর্ঘকালের কঠোর সাধনা-সাপেক্ষ। তথাপি এই হিংসা-বিরোধ-বিদ্বেষপূর্ণ জগতের সকল নরনারীর সমক্ষে সর্বদা অহিংসার পতাকা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রাখিবারও প্রয়োজন আছে। কেন না, ইহাই মানুষমাত্রেরই জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ হওয়া উচিত। এইজন্য হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সকল মানুষকে এই আদর্শ লাভ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ অহিংসার মাহাত্ম্য-ঘোষণায় পঞ্চমুখ ছিলেন। পৃথিবীর সকল নরনারী সর্বধর্ম-সমর্থিত এই মহৎ গুণটিতে বিভূষিত হ'ক এবং এই সর্বোচ্চ নীতির নির্দেশে তাহাদের ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র

ও দৈনন্দিন জীবন পরিচালন করুক, ইহাই ছিল তাঁহার একান্ত কাম্য। তাঁহার গ্রন্থাবলী ও বক্তৃতাসমূহে এই ভাবই বিশেষরূপে পরিস্ফুট। তিনি ছিলেন যথার্থই সর্বভূতে সমদর্শী সন্ন্যাসী। জীবমাত্রকেই শিবরূপে সন্দর্শন তাঁহার প্রধান সাধনা ছিল। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বামীজি ঠিক ঠিক অহিংসায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া এ সম্বন্ধে তিনি বাস্তব জগতের অবাঞ্ছিত সত্যকে উপেক্ষা করেন নাই। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, স্মরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীর প্রায় সকল নরনারীই তাহাদের ভোগ-সুখের তাড়নায় অল্পাধিক হিংসা-বিদ্বেষে প্রমত্ত। তাহারা হিংসাসহায়ে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে ধ্বংসের পথে পাঠাইয়াও আপনাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভোগস্বার্থ চরিতার্থ করিতে সতত উদ্‌গ্রীব। এ অবস্থায় কোন সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে অহিংসারূপ উচ্চনীতি-অবলম্বনে অগণন হিংস্র নরনারীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। বিশ্বময় মানুষের এই শোচনীয় পরিস্থিতি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইলেও ইহা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট সত্য। বাস্তববাদী হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তিক্ত অভিজ্ঞতা-মূলে এই অপ্রিয় কঠোর সত্য স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা আততায়ীর আক্রমণ হইতে রক্ষা

পাইবার জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল গৃহস্থকে আবশ্যক হইলে হিংসার আশ্রয়-গ্রহণের বিধান দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। এই আদর্শের অনুসরণে বাস্তববাদী স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্তকণ্ঠে অহিংসার মহত্ত্ব ঘোষণা করিয়াও ধর্ম-জাতি-নির্বিশেষে ইহলোক ও পরলোকে ভোগ-সুখার্থী সকল গৃহস্থকে আক্রমণাত্মক অত্যুগ্র হিংসার সহিত সংগ্রামে আত্মরক্ষা ও ন্যায্য স্বার্থরক্ষার জন্য আবশ্যক ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক হিংসার আশ্রয়গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং যাঁহারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ সুখকেই বন্ধন বলিয়া যথার্থই মনে করেন, সেই নিবৃত্তিপন্থী মোক্ষকামিগণকে সর্বাবস্থায় অহিংসার উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়া থাকিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদ-নিরসনে
স্বামী বিবেকানন্দ

'পারমার্থিক' শব্দের মানে—পরম (শ্রেষ্ঠ) ধর্মবিষয়ক এবং 'ব্যবহারিক' শব্দের অর্থ—ব্যবহারসম্মত বা প্রয়োগসিদ্ধ, অর্থাৎ সত্য ধর্ম ও ন্যায়-সঙ্গত না হইলেও যাহা ব্যবহার-ক্ষেত্রে প্রচলিত। সর্বত্র দেখা যায়—মানুষের ব্যবহারিক জীবন পরমার্থ-সম্মত হইতেও পারে এবং না-ও হইতে পারে। যাঁহারা পরমার্থের মূল্য বা উপযোগিতা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবন পরমার্থসম্মত না হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে যাঁহারা পরমার্থের মূল্য বা উপযোগিতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবন পরমার্থসম্মত না হওয়া অসঙ্গত অযৌক্তিক ও অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়

যে, অধিকাংশ হিন্দুই পরমার্থকে তাঁহাদের জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াও ব্যবহার-ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে পরমার্থের বিপরীত আচরণ করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না। তাঁহারা স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়াই যে এইরূপ করিয়া থাকেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কোন কোন সত্যসন্ধ ব্যক্তি তাঁহাদের এই দুর্বলতা স্বীকার করেন, কিন্তু অধিকাংশ নরনারীই ব্যবহারিক ধর্মের দোহাই দিয়া তাঁহাদের এই দুর্বলতা ঢাকিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার অদ্ভুত যুক্তি দেখান। এই শ্রেণীর অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই হিন্দুদের মধ্যে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদ স্বীকৃত ও প্রচলিত।

কিন্তু হিন্দুদের পারমার্থিক কোন শাস্ত্রই এই ভেদ সমর্থন করেন না। বেদ উপনিষৎ গীতা ভাগবত প্রভৃতি পারমার্থিক শাস্ত্র দেশ-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে সকল নরনারীকেই পরমার্থের নির্দেশে তাহাদের সমগ্র জীবন পরিচালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন—পরমার্থকে বৃদ্ধ বয়সের বা পরকালের কর্তব্য বলিয়া ফেলিয়া রাখিতে অথবা ইহজীবনে ব্যবহারক্ষেত্রে ইহার বিপরীত আচরণ করিতে বলেন নাই। কেনোপনিষৎ বলেন, "এই শরীরে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পরমার্থ লাভ হয়, আর না

হইলে মহা অনিষ্ট হয়।" যিনি ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমার্থ লাভ করেন, তিনি সকল জীবকে আপনারই আত্মার বহুরূপ বলিয়া সন্দর্শন করিয়া থাকেন। গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যিনি পরব্রহ্মকে সর্বভূতে সমভাবে বা নশ্বর বস্তুতে অবিনাশিরূপে অবস্থিত দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ দর্শী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী। এই অবস্থায় উপনীত হওয়াই হিন্দুর সকল শাস্ত্রমতে পারমার্থিকতার আদর্শ। হিন্দুগণ এই পারমার্থিকতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিকেই ব্যবহারক্ষেত্রে ইহার বিপরীত আচরণ করিতে দেখা যায়।

নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ নিত্য ঋগ্বেদে পাঠ করেন, "তোমাদের সংকল্প সমান, তোমাদের হৃদয়সমূহ সমান এবং তোমাদের অন্তঃকরণসমূহ সমান হ'ক। যাহাতে তোমাদের পরম ঐক্য হয় তাহাই হ'ক।" হিন্দুপণ্ডিত উপনিষৎ-অবলম্বনে শিক্ষা দেন, "সকল ভূতে প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরাত্মরূপে এক সর্বব্যাপী পরমেশ্বরই বিদ্যমান।" হিন্দুধর্ম-প্রচারক বলেন, "সকল দিকে এই আত্মা বিরাজমান বলিয়া সকলই আত্মময়, সংসারে অনাত্মা বলিয়া কিছু নাই।" এই মহান্ উপদেশ সমর্থন করিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচার করেন, "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।" এইরূপে হিন্দুধর্ম-শাস্ত্রমাত্রই মানুষে মানুষে ঐক্য, আত্মার দিক দিয়া সকল

জীবের একত্ব এবং জীবের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের মাহাত্ম্য যেরূপ উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, এরূপ আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্মশাস্ত্র করেন না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, অতি মুষ্টিমেয় হিন্দুই তাহাদের সামাজিক, সাংসারিক ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এই অত্যুচ্চ পারমার্থিক ভাব কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। অধিকাংশ হিন্দুই ধর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বলেন, 'জীবই শিব'—'নরই নারায়ণ', কিন্তু সমাজক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াই ঘোষণা করেন—'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না'। এই দৃশ্য দেখিয়া স্বামীজি ব্যথিত হৃদয়ে বলিয়াছেন, "আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্তমত আছে, কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, কিন্তু আমাদের কার্য্যে মহাভেদবুদ্ধি।" হিন্দুগণ তাহাদের ধর্মজীবন বা পারমার্থিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক তথা ব্যবহারিক জীবনের আকাশ-পাতাল পার্থক্য যেন নির্বিচারে মানিয়া লইয়াছে! আশ্চর্যের বিষয় যে, তাহারা দেখিয়াও দেখিতেছে না, জানিয়াও জানিতেছে না এবং বুঝিয়াও বুঝিতেছে না যে, ইহার তুল্য চরম ভণ্ডামি আর হইতে পারে না।

হিন্দুজাতির এই বিসদৃশ আচরণ দেখিয়া আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় কোন ধর্ম্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার

হিন্দুধর্ম্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম্ম এরূপ করে না। ভগবান্ আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্ম্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক ও ব্যবহারিক' নামক মতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার আসুরিক অত্যাচারের যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে!" অন্যত্র তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "শুন, সখে, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম্ম তো শিখাইতেছেন—জগতে যত প্রাণী আছে সকলেই তোমার আমার বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ—কেবল এই তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব।"

উদ্ধৃত বাক্যে স্বামী বিবেকানন্দ পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদকে 'আত্মাভিমানী ভণ্ডদের আসুরিক অত্যাচারের যন্ত্র' বলিয়া তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। এই শ্রেণী তাহাদের মতবাদের সমর্থনে যে যুক্তি প্রদর্শন করে, তৎসম্বন্ধে স্বামীজি লিখিয়াছেন, "যখন লোককে বলা যায় তোমাদের শাস্ত্রে আছে—সকলের ভিতর এক আত্মা আছেন, সুতরাং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া ও কাহাকেও ঘৃণা না করা শাস্ত্রের আদেশ, লোকে তখন এই ভাব কার্য্যে

পরিণত করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া উত্তর দেয়—পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব সমান বটে, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সব পৃথক্। এই ভেদদৃষ্টি দূর করিবার চেষ্টা না করাতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত দ্বেষ-হিংসা রহিয়াছে।"

পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদের সমর্থনে অনেকে বলেন, 'পারমার্থিক ভাব, সমষ্টি, সমদর্শন, নরমাত্রকেই নারায়ণজ্ঞানে সম্মান-প্রদর্শন প্রভৃতি অতি উচ্চ পারমার্থিক অবস্থা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের উপযোগী; আমরাও যখন তাঁহাদের ন্যায় মহাপুরুষ হইব, তখন ঐরূপ করিব, এখন ব্যবহার-ক্ষেত্রে ঐরূপ উচ্চ ভাব অবলম্বন করিলে আমাদের চলিবে না।' কিন্তু ইঁহারা একবারও তলাইয়া দেখেন না যে, যাহাকে তাঁহারা উচ্চ আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইতেছেন, কার্যতঃ ইহার উল্টা পথে চলিতে থাকিলে ঐ স্থানে পৌঁছান তাঁহাদের পক্ষে কোন কালেও সম্ভব হইবে না। পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে পশ্চিম দিক কি কখনও নিকটবর্তী হয়? অসাম্যের সহায়ে সাম্য, বিরোধের আশ্রয়ে মিলন, অনৈক্যের সাহায্যে ঐক্য, অসংযমের সহায়তায় সংযম, অধর্মের পথে ধর্ম কি কখনও হইতে পারে? স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "কাদা দিয়ে কি কাদা ধোয়া যায়?" সুতরাং পারমার্থিকতা যাঁহাদের

জীবনের লক্ষ্য, তাঁহাদের পক্ষে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে উহার বিপরীত পথে চলা একেবারেই যুক্তিবিরুদ্ধ।

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে—ব্যবহার-ক্ষেত্রে ভেদ-স্বীকার না করিলে হিন্দুসমাজের চাতুর্বর্ণ্য দাঁড়াইবে কোথায়? উত্তরে বলা যায়—হিন্দুসমাজের চাতুর্বর্ণ্য-ব্যবস্থায় ভেদ বা ভোগাধিকার-বৈষম্যের কোন স্থান নাই। গুণ ও কর্ম-অনুসারে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া জীবিকার্জন করা সকল দেশের অধিবাসিগণের পক্ষেই অপরিহার্য। এই গুণ-কর্মগত ভেদ অতিক্রম করা কোন দেশের লোকের পক্ষেই সম্ভব নহে। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিত ও মূর্খে ভেদ, শিক্ষক ও ছাত্রে ভেদ, অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞে ভেদ, স্বাস্থ্যবান ও রুগ্নে ভেদ, পরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃতে ভেদ, সংযমী ও অসংযমীতে ভেদ প্রভৃতি বহুবিধ ভেদ অনতিক্রমণীয়। কিন্তু এই ভেদগুলি আছে বলিয়াই মানব-সমাজে মানুষে মানুষে কোন বিষয়ে জন্মগত ভোগ ও অধিকারের পার্থক্য এবং উন্নতি-লাভের সুযোগে তারতম্য থাকা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষে সকল নরনারীর সমান-অধিকার থাকা সঙ্গত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ থাকিবেই। কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে যে, অধিকার-তারতম্যগুলিও থাকিবে। এগুলিকে সমূলে নির্মূল করিতে হইবে।"

দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানেও হিন্দুসমাজপতিগণ পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদের দোহাই দিয়া চারিবর্ণে ভেদ বৈষম্য ও ভোগাধিকার-তারতম্যকে আঁকড়াইয়া আছেন। তাঁহারা দেশের মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘিষ্ঠ নরনারীকে সমাজে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদিগকে সকল বিষয়ে অধিকার এবং উন্নতিলাভের সুযোগ দিয়াছেন এবং যাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ—যাঁহাদিগকে লইয়া দেশ, তাঁহাদিগকে সমাজে নিম্নস্থান দিয়া বহুবিষয়ে অধিকার ও উন্নতিলাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল কারণে হিন্দুসমাজ অনৈক্য-বিরোধ-বিদ্বেষের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই জন্য হিন্দুজাতি স্বগৃহে শতধা বিচ্ছিন্ন, সংঘশক্তিহীন, উত্থানশক্তিরহিত পঙ্গু। ইহাই হিন্দুদের গৃহবিবাদ এবং তৎসম্ভূত রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থ-নীতিক হীনাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ববিধ দুঃখ দৈন্য ও দুর্দশার মূল কারণ।

এক শ্রেণীর প্রভুত্ব-লোলুপ স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের চেষ্টায় পরমার্থ বা ধর্মের নির্দেশে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন পরিচালিত না হওয়ায় তাঁহাদের জাতীয় জীবনে দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, বর্তমানেও অধিকাংশ হিন্দুর ধর্মক্ষেত্রে চলিয়াছে ধর্মের নামে ভণ্ডামি, সমাজ-ক্ষেত্রে চলিতেছে

জন্মগত জাত্যভিমান এবং তৎপ্রসূত মানুষের প্রতি মানুষের অপমান ও অসম্মান, সংসার-ক্ষেত্রে চলিতেছে যে-কোন প্রকারে অর্থোপার্জন, ব্যবসাক্ষেত্রে চলিতেছে উৎকোচ ভেজাল ও জুয়াচুরি, রাষ্ট্রক্ষেত্রে চলিতেছে দলগত প্রভুত্ব ও স্বার্থসাধনের নির্লজ্জ প্রচেষ্টা! পরমার্থবিরোধী তুর্নীতি যেন অধিকাংশ হিন্দুর জীবনের প্রচলিত নীতি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে! কারণ ভিন্ন কোন কার্য হইতে পারে না, ইহা সত্য হইলে মানিতেই হইবে যে, হিন্দুজাতির জাতীয় অধঃপতনের উহা অন্যতম প্রধান কারণ। সত্যের অনুরোধে ইহাও স্বীকার্য যে, হিন্দুদের ন্যায় মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতির মধ্যেও এই দোষগুলির কোন কোনটি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু এই প্রবন্ধে অহিন্দু জাতিসমূহের সমস্যা আমাদের আলোচ্য নহে। অধিকাংশ হিন্দুর মন হইতে পারমার্থিক গুণাবলী নির্বাসিত হইয়া সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে পরমার্থ-বিরোধী অধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলেই যে তাহাদের জাতীয় জীবন নানাবিধ সমস্যা-সংকুল হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে আর মতদ্বৈধ নাই।

তুঃখের বিষয়—স্বাধীন ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ ঐহিক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া সকল ভারতবাসীর—বিশেষতঃ ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্মচারিমাত্রেরই ব্যবহারিক জীবনকে

পারমার্থিক জীবন হইতে আইনতঃ পৃথক্ করায় আমাদের জাতীয় জীবন-সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ব্যবস্থায় সকলেরই স্বগৃহে ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা থাকিলেও রাষ্ট্রক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ঐহিক হইয়া ধর্মনিরপেক্ষতা-অবলম্বন বাধ্যতামূলক। কিন্তু কায়মনোবাক্যে ধর্মভাবান্বিত কোন ব্যক্তির পক্ষে ধর্মকে ব্যবহারিক জীবন হইতে কিছুকালের জন্যও একেবারে পৃথক্ করিয়া রাখা কি সম্ভব? কোন ধর্মশাস্ত্র যে ইহা সমর্থন করেন না এবং সকল শাস্ত্রই যে সকল নরনারীকে সর্বাবস্থায় ধর্মভাবান্বিত থাকিতে উপদেশ দেন, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই কোন ধর্মবিশ্বাসীর পক্ষে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় রাষ্ট্রক্ষেত্রেও ধর্মনিরপেক্ষতা-অবলম্বন সকল ধর্ম-বিরুদ্ধ। স্মরণাতীত কাল হইতে ধর্মভূমি নামে অভিহিত ভারতের অধিকাংশ নরনারী স্বগৃহে ধর্মপালন করিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ঐহিক বা ইহকাল-সর্বস্ব হইয়া একেবারে ধর্মনিরপেক্ষ থাকিবেন, ইহা আশা করাও অযৌক্তিক। তবে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য যে, আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বহু-ধর্ম-প্লাবিত ভারতে কোন একটি বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করা গণতন্ত্রসম্মত নহে। ইস্লামধর্মাবলম্বিগণের বহুপ্রশংসিত ইস্লামিক গণতন্ত্রে (Islamic Democracy) এবং খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের খৃষ্টান গণতন্ত্রে (Christian Demo-

cracy) অখৃষ্টান ধর্ম ও সংস্কৃতির কোন সম্মানজনক স্থান নাই বলিয়া এতদুভয় ধর্মকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক বলা যায় না। এজন্য উভয় ধর্ম-প্রভাবিত রাষ্ট্রই খাঁটি 'থিয়-ক্র্যাটিক্' (Theocratic) অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশেষ-প্রাধান্যপূর্ণ ! হিন্দুধর্ম বাহ্যতঃ বিবদমান বহু ধর্মের সমষ্টি বলিয়া ইহা এবং ইহার অন্তর্গত কোন একটি মতকেও স্বাধীন ভারতের সার্বজনীন রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে গ্রহণ করা গণতন্ত্র-সম্মত নহে। পক্ষান্তরে, ভারতের প্রায় ষোল আনা ধর্মবিশ্বাসী নরনারীর রাষ্ট্রকে আইনবলে সুকৌশলে ধর্ম-নিরপেক্ষ ঐহিক করিয়া রাখাও একেবারে গণতন্ত্র-বিরুদ্ধ। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপেই যে দেশশুদ্ধ নরনারী জড়বাদ, উচ্ছৃঙ্খল ভোগ ও নানাবিধ দুর্নীতির দিকে প্রধাবিত হইবার প্রেরণা পাইতেছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। স্বাধীনতা-লাভের পর ভারতের জাতীয় জীবনের চিরন্তন বিশেষত্ব ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি সত্য ন্যায় নীতি সংযম পরার্থপরতা প্রভৃতির প্রভাব যে ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে, ইহার কারণ কি ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ধর্মভাব-শূন্যতা নহে ? মহাত্মা গান্ধীও বলিয়াছেন, "ধর্মহীন রাজনীতি একটি বিপজ্জনক আমোদ-বিশেষ (a dangerous pastime), ইহার প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তির অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না।" ধর্মবিশ্বাসী মহাত্মাজীর এই

অভিমতের সঙ্গে তাঁহার মতানুসরণকারীদের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সামঞ্জস্য কোথায়? স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বর্তমানেও অধিকাংশ শাসক ও শাসিতের দুর্নীতির মূল কারণ তাঁহাদের নিছক ঐহিকতা বা ধর্মহীনতা। সুতরাং ধর্মের আশ্রয়গ্রহণই ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায়।

এই সকল কারণে যুগধর্মাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রবর্তিত সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত সর্বধর্মসমন্বয় স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মনীতিরূপে পরিগৃহীত হওয়া সঙ্গত। ইহাতে পৃথিবীর সকল ধর্মের সম্মানিত স্থান আছে, তথাপি কোন ধর্মসম্প্রদায়বিশেষের প্রাধান্য, কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, পরমত-অসহিষ্ণুতা, গোঁড়ামি, হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতির কোন স্থান নাই। প্রচলিত রাজনীতিক গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনীতিক দল তথা উহার মুষ্টিমেয় নেতাই দেশে সর্বেসর্বা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত সর্বধর্মসমন্বয়রূপ গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সকল সম্প্রদায়ই সকল বিষয়ে সমান অধিকার ও সমসম্মানপ্রাপ্ত। এই সমন্বয়-নীতি সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীর বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখিয়াও তাঁহাদিগকে যথার্থ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়া গণতান্ত্রিক জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পন্থা। সর্বধর্মসমন্বয়বাদ সকল ধর্মের মূলতত্ত্ব পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ

করিয়াও প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায়সমূহের দোষগুলি হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত। ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা যথার্থ ধর্মজীবন যাঁহাদের কাম্য, তাঁহারা সকলেই এই অত্যুদার মতের সমর্থক। স্বামী বিবেকানন্দের মতে ধর্মভূমি ভারতবর্ষে বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের একত্র সমাবেশই জাতীয় ঐক্যপ্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ উপায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত সর্বধর্মসমন্বয়ে এই উপায় পূর্ণরূপে প্রকটিত। মানব-সমাজ হইতে সর্ববিধ ধর্মবিরোধ দূর করিয়া বিশ্বমানবের ধর্মরাজ্যে শান্তি-প্রতিষ্ঠারও ইহাই একমাত্র পথ। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মনীতি কিরূপ হওয়া সঙ্গত তাহা নিজ জীবন দ্বারা কার্যতঃ প্রদর্শনের জন্য ভারতের জাতীয় জাগরণ-প্রারম্ভে যুগধর্মাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। তাঁহার প্রবর্তিত সর্বধর্মসমন্বয় কোন ধর্ম নহে, পরন্তু সকল ধর্মের মুখ্য নীতি। এই বিশ্বজনীন নীতিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ধর্মনীতি বলিয়া গ্রহণ করিতে ধর্মবিশ্বাসী কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। ইহা গ্রহণ করিলে ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি-অবলম্বনের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। স্বাধীন ভারতের গণপরিষৎ (Constituent Assembly) ধর্মে সকল নরনারীকে স্বাধীনতা দিয়াও রাষ্ট্রক্ষেত্রে ধর্ম-নিরপেক্ষতা বাধ্যতামূলক করিয়া পরোক্ষভাবে এই সর্ব-ধর্মসমন্বয়-নীতিই কার্যতঃ অবলম্বন করিয়াছেন। মুসলমান-

অভিমতের সঙ্গে তাঁহার মতানুসরণকারীদের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সামঞ্জস্য কোথায়? স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বর্তমানেও অধিকাংশ শাসক ও শাসিতের দুর্নীতির মূল কারণ তাঁহাদের নিছক ঐহিকতা বা ধর্মহীনতা। সুতরাং ধর্মের আশ্রয়গ্রহণই ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায়।

এই সকল কারণে যুগধর্মাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রবর্তিত সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত সর্বধর্মসমন্বয় স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মনীতিরূপে পরিগৃহীত হওয়া সঙ্গত। ইহাতে পৃথিবীর সকল ধর্মের সম্মানিত স্থান আছে, তথাপি কোন ধর্মসম্প্রদায়বিশেষের প্রাধান্য, কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, পরমত-অসহিষ্ণুতা, গোঁড়ামি, হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতির কোন স্থান নাই। প্রচলিত রাজনীতিক গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনীতিক দল তথা উহার মুষ্টিমেয় নেতাই দেশে সর্বেসর্বা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত সর্বধর্মসমন্বয়রূপ গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সকল সম্প্রদায়ই সকল বিষয়ে সমান অধিকার ও সমসম্মানপ্রাপ্ত। এই সমন্বয়-নীতি সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীর বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখিয়াও তাঁহাদিগকে যথার্থ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়া গণতান্ত্রিক জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পন্থা। সর্বধর্মসমন্বয়বাদ সকল ধর্মের মূলতত্ত্ব পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ

করিয়াও প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায়সমূহের দোষগুলি হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত। ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা যথার্থ ধর্মজীবন যাঁহাদের কাম্য, তাঁহারা সকলেই এই অত্যুদার মতের সমর্থক। স্বামী বিবেকানন্দের মতে ধর্মভূমি ভারতবর্ষে বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের একত্র সমাবেশই জাতীয় ঐক্যপ্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ উপায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত সর্বধর্মসমন্বয়ে এই উপায় পূর্ণরূপে প্রকটিত। মানব-সমাজ হইতে সর্ববিধ ধর্মবিরোধ দূর করিয়া বিশ্বমানবের ধর্মরাজ্যে শান্তি-প্রতিষ্ঠারও ইহাই একমাত্র পথ। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মনীতি কিরূপ হওয়া সঙ্গত তাহা নিজ জীবন দ্বারা কার্যতঃ প্রদর্শনের জন্য ভারতের জাতীয় জাগরণ-প্রারম্ভে যুগধর্মাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। তাঁহার প্রবর্তিত সর্বধর্মসমন্বয় কোন ধর্ম নহে, পরন্তু সকল ধর্মের মুখ্য নীতি। এই বিশ্বজনীন নীতিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ধর্মনীতি বলিয়া গ্রহণ করিতে ধর্মবিশ্বাসী কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। ইহা গ্রহণ করিলে ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি-অবলম্বনের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন থাকিবে। স্বাধীন ভারতের গণপরিষৎ (Constituent Assembly) ধর্মে সকল নরনারীকে স্বাধীনতা দিয়াও রাষ্ট্রক্ষেত্রে ধর্ম-নিরপেক্ষতা বাধ্যতামূলক করিয়া পরোক্ষভাবে এই সর্ব-ধর্মসমন্বয়-নীতিই কার্যতঃ অবলম্বন করিয়াছেন। মুসলমান-

প্রধান ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সংবিধানে (Constitution) ঘোষিত হইয়াছে, 'সকল মানুষের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস-ভিত্তির উপর ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত' (The Republic of Indonesia is based on a Faith in the God of All Mankind)। এই ভাবে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা বা কোন ধর্মবিশেষ সমর্থিত না হইয়াও সাক্ষাৎসম্বন্ধে পৃথিবীর সকল ধর্ম অর্থাৎ সর্বধর্মসমন্বয়ই অবলম্বিত হইয়াছে। খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "পণ্ডিত নেহেরু কর্তৃক পরিচালিত তথাকথিত নিরীশ্বর ভারত-রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারক বাণীরূপে "সত্যমেব জয়তে"—'সত্যেরই জয় হয়' এই উপনিষদের বাক্য গৃহীত হইয়াছে। এই বাক্য গ্রহণ করিয়া ইঁহারা অজ্ঞাতসারে ভারতীয় জাতির অন্তর্নিহিত আস্থাকেই প্রকট করিয়াছেন।" কারণ, হিন্দুশাস্ত্রসার বেদান্তমতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং জগতের অন্যান্য সকলই তত্ত্বতঃ মিথ্যা। এ জন্য বলা যায়—স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষভাবে 'সত্য' স্বীকৃত হওয়ায় ব্রহ্ম তথা ঈশ্বরও পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধর্ম সমর্থিত না হওয়ায়, ইহা সাধারণ দৃষ্টিতে ধর্মহীনতা বা জড়বাদ-সমর্থনতুল্য বিভ্রান্তি-জনক হইয়াছে। এইজন্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর্বধর্ম-সমর্থন-নীতি গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের ধর্মসম্বন্ধীয় রাষ্ট্রনীতি

হওয়া একান্ত আবশ্যক। মহাত্মা গান্ধীও তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন প্রার্থনা-সভায় এই সর্বধর্মসমন্বয়ই কার্যতঃ প্রচার করিয়াছেন। এই মহতী নীতি স্বাধীন ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রনীতিরূপে পরিগৃহীত হইলে ধর্মের উপর গুরুত্ব প্রদত্ত হইবে; ইহার প্রভাবে জাতীয় জীবন হইতে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদ বিদূরিত এবং ধর্ম ও উহার আনুষঙ্গিক সত্য ন্যায় নীতি সংযম প্রভৃতি দ্বারা সকল নরনারীর জীবন প্রভাবিত হইবার সুযোগ পাইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম যদি মানুষের সর্ব্বাবস্থায় তাহাকে সহায়তা করিতে না পারে, তবে উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই, ইহা কতকগুলি ব্যক্তির মতবাদমাত্র।" তাঁহার এই নির্দেশে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র সমাজ শিক্ষা কৃষি শিল্প প্রমুখ সকল বিভাগ ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিতেই হইবে। এজন্য অসাম্য ভেদ বিরোধ প্রভৃতি পরমার্থবিরোধী বিষয়কে আমাদের সামাজিক সাংসারিক ও ব্যবহারিক জীবন হইতে একেবারে উচ্ছেদ করা দরকার। মনে রাখিতে হইবে যে, পরমার্থকে ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে কর্মে পরিণত করাতেই উহার সার্থকতা। পরমার্থ বা ধর্মকে গ্রন্থে, মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে এবং সাধকের সাধন-সম্পদে সীমাবদ্ধ রাখিলে উহাদ্বারা জনসাধারণের কোন উপকার হইবে না—

উহা চিরকাল তাহাদের নিকট নির্বস্তুক তত্ত্বে বা অর্থহীন শব্দমাত্রেই পর্যবসিত থাকিবে। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে-সকল ধর্ম-প্রবর্তক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই পরমার্থকে ব্যবহারিক জীবন হইতে পৃথক রাখিতে উপদেশ দেন নাই। পক্ষান্তরে, তাঁহারা সকলেই সমস্বরে পরমার্থের নির্দেশে মানুষমাত্রেরই দৈনন্দিন জীবন পরিচালন করিতে বিশেষ জোরেব সহিত উপদেশ দিয়াছেন।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধন-জীবন ও উপদেশ এ বিষয়ে সকলের পথ-প্রদর্শক। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' আছে, "ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতে সমাগত কাঙ্গালীদিগকে নারায়ণ-জ্ঞান করিয়া ঠাকুর এক সময়ে তাহাদের ভোজনাবশেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন—একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হলধারী উহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'তোর ছেলে-মেয়ের কেমন করিয়া বিবাহ হয় তাহা দেখিব।' জ্ঞানাভিমানী হলধারীর মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়া ঠাকুর উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তবে রে শালা, শাস্ত্রব্যাখ্যা কর্‌বার সময় তুই না বলিস্, জগৎ মিথ্যা ও সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয়! তুই বুঝি ভাবিস্ আমি তোর মত জগৎ মিথ্যা বল্‌বো, অথচ ছেলে-মেয়ের বাপ হবো! ধিক তোর শাস্ত্রজ্ঞানে!' "

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনালোকে আলোকিত বেদান্তের

জীবব্রহ্মভাবের চূড়ান্ত সাম্য মৈত্রী ও সমদর্শনের এই মহান্ আদর্শে সকল নরনারীর ব্যবহারিক জীবন পরিচালন করিতে স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার এই উপদেশ-অনুসারে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদ একেবারে উঠাইয়া দিয়া পরমার্থের নির্দেশে হিন্দুজাতির ব্যবহারিক জীবন পরিচালন করাই তাহাদের জাতীয় সমস্যা-সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায়। বর্তমান পরিস্থিতির আলোকেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীন ভারতের সাম্যমৈত্রীমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে হিন্দুদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে এই উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে।

নর-নারায়ণ-সেবায়

স্বামী বিবেকানন্দ

উপনিষৎ বলেন, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—'জগতের সকলই ব্রহ্ম', "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—'জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নয়', "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্"—'পৃথিবীর সকলই আত্মস্বরূপ', "ত্বমেকোঽসি বহুতনুপ্রবিষ্টঃ"—'তুমি এক হইয়াও বহু দেহে বিরাজিত', "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা"—'একই দেব সর্বব্যাপী এবং সকল ভূতের অন্তরাত্মারূপে লুকায়িত।' এই সর্বজনবিদিত বেদান্তবাক্যসমূহে অতি স্পষ্ট যে, এক ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাই সকল নরনারীর মধ্যে বিদ্যমান। এই আত্মাকে দেবদেবী অবতার গুরু বা ইষ্টরূপে আপনার ভিতরে ও বাহিরে সর্বভূতে দর্শন করাই হিন্দুর সকল

সাধনার সর্বোচ্চ আদর্শ। এইরূপে সর্বভূতে ইষ্টদর্শন বা সমদর্শনই মুক্তি। হিন্দুশাস্ত্র বলেন, "ন লিঙ্গং ধর্মকারণং সমতা সর্বভূতেষু এতন্মুক্তস্য লক্ষণম্"—'বাহ্যিক চিহ্নধারণ ধর্মের কারণ নয়, সর্বভূতে সমদর্শনই মুক্তের লক্ষণ।' শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, "ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তুঃ সমদর্শনাৎ"—'কর্তৃত্বাভিমানশূন্য সমদর্শী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমি দেখি না।' গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"—'পণ্ডিত বা তত্ত্বজ্ঞ সাধকমাত্রই সমদর্শী হইয়া থাকেন।' "যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পদম্"—'তত্ত্বজ্ঞ সাধকের যেখানে-যেখানে মন যায় সেখানে-সেখানেই তিনি ইষ্টদর্শন করেন।' বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুসাধনার চরমাবস্থায় উপনীত হইয়া দেখেন, "বাসুদেবঃ সর্বমিতি"—'সকলই বাসুদেব।' শাক্তগণ শক্তিসাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়া প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া প্রচার করেন, "যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"—'দেবীই সর্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা।' গাণপত্যগণ সাধনার শেষ অবস্থায় সর্বভূতে ইষ্টকে দর্শন করিয়া বলেন, "সদা বিশ্বরূপং গণেশং নতাঃ স্মঃ"—'বিশ্বরূপী গণপতিকে নমস্কার।' যোগিগণও সমাধিলাভান্তে সর্বত্র পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যোগী সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শী হইয়া স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্বভূতে

এবং সর্বভূতকে স্বীয় আত্মাতে দর্শন করেন।” সুতরাং কেবল আপনার অভ্যন্তরস্থিত আত্মাকে ব্রহ্মরূপে দর্শন নয়, পরন্তু তাঁহারই বহুরূপে সকল জীবকে ব্রহ্মরূপে দর্শনে হিন্দুর সকল সাধনার পূর্ণতা নিহিত। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল ধর্মসাধনার সর্বোচ্চ শীর্ষে উপনীত হইয়া প্রাগুক্ত শাস্ত্রবাণীসমূহের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, “দেখি কি—যেন গাছ-পালা, মানুষ, গরু, ঘাস, জল সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের খোলগুলো! বালিসের খোল যেমন হয় দেখিস্ নি?—কোনটা খেরোর, কোনটা ছিটের, কোনটা বা অন্য কাপড়ের, কোনটা চারকোণো, কোনটা গোল—এই রকম। আর বালিসের ঐ সব রকমের খোলের ভিতরে যেমন একই জিনিষ—তুলোভরা থাকে, সেই রকম ঐ মানুষ, গরু, ঘাস, জল, পাহাড়, পর্ব্বত সব খোলগুলোর ভিতরেই সেই এক সচ্চিদানন্দ রয়েছেন। ঠিক ঠিক দেখতে পাইরে, মা যেন নানা রকমের চাদর মুড়ি দিয়ে, নানা রকম সেজে ভেতর থেকে উঁকি মারছেন। একটা অবস্থা হয়েছিল যখন সদা-সর্ব্বক্ষণ এই রকম দেখতুম।” অন্যত্র বলিয়াছেন, “তাঁকে সর্ব্বভূতে দর্শন করতে লাগলুম! পূজা উঠে গেল। এই বেলগাছ, বেলপাতা তুলতে আসতুম। একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁশ খানিকটা উঠে এল। দেখলাম, গাছ চৈতন্যময়

মনে কষ্ট হলো। * * একদিন ফুল তুলতে গিয়েছি, দেখিয়ে দিলে, গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট—পূজা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া! আর ফুল তোলা হলো না। * * কালীঘরে পূজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়—কোশাকুশী, বেদী, ঘরের চৌকাঠ, সব চিন্ময়। মানুষ, জীব, জন্তু সব চিন্ময়! তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলুম! যা দেখি তাই পূজা করি।" এই প্রমাণাবলী হইতে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যথার্থই সর্বভূতে ব্রহ্ম বা ইষ্টের অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছিলেন। একদিন তিনি তাঁহার ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "মাকে বল্‌লুম (গলায় ক্ষত দেখাইয়া) 'এইটের দরুন কিছু খেতে পারি না, যাতে দুটি খেতে পারি তা করে দে।' তা মা বললেন তোদের সকলকে দেখিয়ে—'কেন? এই যে এত মুখে খাচ্ছিস্।' আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না।" এই ভাবে তিনি মহামায়ার কৃপায় বেদান্তের জীবব্রহ্মবাদকে নিজ দেহে রূপ দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনালোকে বেদান্তবেদ্য 'জীব-শিব'-ভাবকে অবলম্বন করিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ জীবের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি মানুষকে শিবরূপে সেবা করিবার মহত্ত্ব অতি উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন,

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

এই জীবব্রহ্মবাদ এতকাল শাস্ত্রে, মুষ্টিমেয় দার্শনিক পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে এবং অল্পসংখ্যক সন্ন্যাসীর সাধন-সম্পদ্‌রূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ ইহাকে লোকালয়ে আনিয়া "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—'নিজের মুক্তি ও জগতের হিতার্থে' প্রয়োগ করিবার কৌশল দেখাইয়াছেন। তিনি যেমন "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" উপলব্ধি করিয়া মানুষকে মোক্ষলাভ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তেমনভাবে জোরের সহিত উপদেশ দিয়াছেন সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে সকল নরনারীর মধ্যে বিরাজমান জানিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে। এই আদর্শ কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানদ্বয় বেদান্তের জীবব্রহ্মবাদকে সাধনা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে এবং মানুষের সেবায় ইহাকে প্রয়োগ করিতে শিক্ষা দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত নরনারায়ণ-সেবা-ধর্ম বৌদ্ধযুগের ভিক্ষুদের বা মধ্যযুগের ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের

অনুষ্ঠিত সেবা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৌদ্ধযুগের পূর্ণ জোয়ারের সময় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ সকল নরনারীকে সেবা করিতেন নির্বাণ-মোক্ষলাভে তাহাদিগকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে। তাঁহাদের সেবার মূলে ছিল প্রধানতঃ দয়া বা করুণা। ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের আচরিত সেবাও ছিল দয়া বা করুণামূলক। দ্বৈতভাব বা ভেদবুদ্ধির জন্য এই সকল শ্রেণীর অনুষ্ঠিত সেবায় সেব্য ও সেবকের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "তিনি (সর্বেশ্বর আত্মা) সমষ্টিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ। অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম দুই একই। বিশেষ এই—জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয় তাহা দয়া, প্রেম নহে, আর আত্মবুদ্ধিতে যে জীবের সেবা করা হয় তাহা প্রেম। * * আমরা অদ্বৈতনিষ্ঠ, আমাদের জীববুদ্ধি বন্ধনের কারণ। অতএব, আমাদের অবলম্বন প্রেম, দয়া নহে। আমরা দয়া করি না, সেবা করি। কাহাকেও দয়া করিতেছি, এ অনুভব আমাদের নাই; তৎপরিবর্তে আমরা সকলের মধ্যে প্রেমানুভূতি ও আত্মানুভব করিয়া থাকি।" তাঁহার প্রচারিত নর-নারায়ণ-সেবায় সেব্য-সেবকের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইহাতে সেব্য-সেবক উভয়ে আত্মার দিক দিয়া এক ও অভেদ। এই অভেদাত্মক

ভাবের মূল উৎস উপনিষৎ। স্বামীজি উপনিষদের অদ্বৈতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই মানুষকে নারায়ণ-জ্ঞানে আপন আত্মার সঙ্গে অভেদ-বোধে সেবা করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত নর-নারায়ণ-সেবা উপনিষৎ-প্রচারিত 'আত্মার উপাসনারই' একপ্রকার অভিনব প্রণালী।

উপনিষৎ একমাত্র আত্মাকেই সর্বাপেক্ষা প্রিয়বুদ্ধিতে উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন, "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত"—'আত্মাকেই প্রিয়-বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে।' শ্রুতিতে আছে—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ"—'এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইনি সকলের অনুভূয়মান বা সর্বত্র দেদীপ্যমান।' হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যজ্ঞানই বিদ্যা, এতদুভয়ের ভেদজ্ঞান অবিদ্যা। "আত্মৈব দেবতাঃ সর্বাঃ"—'আত্মাই সকল দেবতা'—দেবতাগণ আত্মস্বরূপ বা আত্মারই এক একটি রূপ। এইজন্য হিন্দুর সকল শাস্ত্র দেব-দেবীগণকে আত্মস্বরূপে উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন, "যে ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্যকে প্রিয়বুদ্ধিতে উপাসনা করে, তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ বলিবেন, তোমার প্রিয়বস্তু বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।" হিন্দুর সাকার-নিরাকার সগুণ-নির্গুণ সকল ভাবের উপাসনা একমাত্র আত্মারই উপাসনা। শ্রীমদ্ভাগবতে

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমি সর্বপ্রাণীতে বর্তমান, সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর, যে ব্যক্তি মূঢ়তা-বশতঃ আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমাপূজা করে, তাহার কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করা হয়।" জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ রাজযোগ ও কর্মযোগ মূলতঃ আত্মার উপাসনারই এক একটি প্রণালী। প্রতিমায় পটে ঘটে যদি উপাস্য দেব বা দেবীকে আহ্বান করিয়া আত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপে পূজা করা যায়, তাহা হইলে মানুষে এইরূপ পূজা করা যাইবে না কেন? নাম-রূপের অব্রহ্ম বস্তুতে যদি ব্রহ্মের অনুসন্ধান সম্ভব হয়, তাহা হইলে জীব-ব্রহ্মে—বিশেষ করিয়া জীবশ্রেষ্ঠ মানুষে তাহা কেন সম্ভব হইবে না? অন্যান্য প্রতীকের ন্যায় মানুষরূপ প্রতীকেও নারায়ণ বা ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে। হিন্দুশাস্ত্র বলেন, "প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্ সর্বত্র বিদিতাত্মনাম্"—'অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি-গণের দেবতা প্রতিমায়, কিন্তু আত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের দেবতা সর্বত্র।' আচার্য শংকর তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে বলিয়াছেন, "যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু-আদি দৃষ্টি আরোপ করিতে হয়, তদ্রূপ প্রতীকেও ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপ করিতে হয়, সুতরাং প্রতীকোপাসনা ব্রহ্মেরই উপাসনা।" হিন্দুর অবতারবাদ এবং গুরুবাদও মানুষের দেহে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্বীকার করে। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন, "মাতৃদেবো ভব,

পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব।" স্বামী বিবেকানন্দ আর একটু অগ্রসর হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন, "দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব, চণ্ডালদেবো ভব।" শ্রীমদ্ভাগবত ইহা সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্ ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি"—'ঈশ্বর জীবরূপ ধারণ করিয়া সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এই জ্ঞানে বহুমান প্রদানপূর্বক সকল জীবকে প্রণাম করিবে।' বেদান্তদর্শন বলেন, "তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ"—'লোকমূর্তি আত্মস্বরূপ বিরাট পুরুষকে নমস্কার।' "বিবিধরাজমানত্বাৎ বিরাট্"—'বিবিধ জীবরূপে বিরাজমান বলিয়া ব্রহ্ম 'বিরাট' নামে অভিহিত।' "জীবঃ শিবঃ"—'জীবমাত্রই শিবস্বরূপ।' সর্বধর্মসমন্বয়-সাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল ধর্ম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলে বলিয়াছেন, "তিনি মানুষ হয়েও লীলা করছেন। আমি দেখি সাক্ষাৎ নারায়ণ! কাঠ ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে যেমন আগুন বেরোয়, ভক্তির জোর থাক্‌লে মানুষেতেই ঈশ্বর দর্শন হয়! * * প্রতিমায় পূজা হয়, আর জীবন্ত মানুষে কি হয় না?" এই অভিমতদ্বারা সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, আত্মস্বরূপে প্রতিমাদি-পূজার স্থায় মানুষের পূজাও একই প্রকার ফলপ্রদ। উল্লেখ

বাহুল্য যে, মানুষের পূজা অর্থে মানুষের স্থূল সূক্ষ্ম বা কারণ-দেহের পূজা বুঝায় না, মানুষের মধ্যে যে আত্মরূপী নারায়ণ রহিয়াছেন তাঁহারই পূজা বুঝায়। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত নর-নারায়ণ-পূজা নূতন হইলেও হিন্দুশাস্ত্র-প্রচারিত আত্মা বা ব্রহ্ম-উপাসনার দিক দিয়া নূতন নয়।

ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার সন্দর্শন হিন্দুর সকল সাধনার উদ্দেশ্য হইলেও প্রত্যেক সাধন-প্রণালী যেমন পৃথক্, নর-নারায়ণ-সেবারূপ আত্মোপাসনার পদ্ধতিও তেমন স্বতন্ত্র। যে আত্মরূপী নারায়ণ আমার দেহে আছেন, তিনিই জগতের সকল নরনারীর দেহে অধিষ্ঠিত, এই অভেদাত্মক দৃঢ় প্রত্যয়-মূলে অন্ধ খঞ্জ দরিদ্র রুগ্ন প্রভৃতি রূপধারী নারায়ণকে পরম শ্রদ্ধাসহকারে জ্ঞানদান অন্নবস্ত্রদান ঔষধদান সেবা-শুশ্রূষা এবং দেশ জাতি সমাজের সেবা প্রভৃতি এই পূজার বিশেষত্ব। মূর্তি ঘট পট প্রভৃতিতে যেমন উপাস্যকে আত্মজ্ঞানে আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহকারে যথাযোগ্য উপচারে পূজা না করিলে সেই পূজা ফলপ্রসূ হয় না, নরনারায়ণ-পূজাতেও তেমন নরকে আপনার সহিত অভিন্নাত্মক নারায়ণ জ্ঞানে পরম ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত যোগ্য উপচারে পূজা না করিলে উহা পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হইয়া থাকে। উভয়ক্ষেত্রে আত্মরূপী নারায়ণভাব-আরোপের উপরই পূজার সাফল্য নির্ভর করে। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত নরনারায়ণ-

উপাসনা কেবল চিত্তশুদ্ধি-বিধায়ক নিষ্কাম অনাসক্ত পরার্থ কর্মমাত্র নয়, পরন্তু জ্ঞান যোগ ভক্তি ও কর্মের অপূর্ব সামঞ্জস্যে সমন্বিত উপনিষৎ-সমর্থিত আত্মার উপাসনারই এক অভিনব সাধন-পদ্ধতি। কেন না, ইহাতে জ্ঞানযোগসহায়ে নরকে আত্মরূপী নারায়ণ বলিয়া জানিতে, রাজযোগসহায়ে আত্মরূপী ঈশ্বরের প্রণিধান করিতে, ভক্তিযোগসহায়ে তাঁহার প্রতি পরম অনুরক্ত হইতে এবং নিষ্কাম নিঃস্বার্থ কর্মসহায়ে তাঁহার সেবা করিতে হয়।

'এই সেবাধর্ম গীতোক্ত নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মযোগেরই এক নূতন পদ্ধতি। নরনারায়ণ-সেবারূপ কর্ম যথার্থই ব্রহ্মভাবাশ্রিত। এই সেবাধর্মে নরের প্রতি ব্রহ্মবুদ্ধি সুদৃঢ় থাকায় ব্রহ্মভাবানুপ্রাণিত কর্মযোগী ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। গীতায় আছে, "ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম-সমাধিনা"—'কর্মে ব্রহ্মবুদ্ধিসম্পন্ন সাধকের প্রাপ্তব্য ফলও ব্রহ্ম।' জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের ন্যায় এই নরনারায়ণ-সেবারূপ কর্মযোগও আসক্তিশূন্য হইয়া করিলে সাধক পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ"—'অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে সাধক নিশ্চয়ই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবও গীতোক্ত কর্মযোগকে ঈশ্বরলাভের একটি পথ বলিয়া স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, "সর্ব্বভূতে হরির সেবা—জীব-জন্তুর মধ্যেও হরির সেবা যদি কেউ করে, আর যদি সে মান চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা করছে তাদের কাছ থেকে উল্‌টে কোনও উপকার চায় না, এরূপভাবে যদি সেবা করে, তাহলে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম, অনাসক্ত কর্ম্ম করা হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করলে তার নিজের কল্যাণ হয়। এরই নাম কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগও ঈশ্বর-লাভের একটি পথ।" স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সাধনদ্বারা যেমন আত্মবিকাশ হয়, পরার্থে কর্ম্মদ্বারাও ঠিক তাই হয়।" গীতায়ও ঠিক এইরূপ আছে —"একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"—'যিনি জ্ঞানযোগ ও নিষ্কাম কর্মযোগের ফল একই মোক্ষ দেখেন তিনিই সম্যগ্‌দর্শী।' বেদান্তসমর্থিত নরকে নারায়ণজ্ঞানে সেবায় উদ্বুদ্ধ কর্মযোগী সকলকে আত্মস্বরূপে সেবা করার ফলে সমদর্শনে উপনীত হন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছেন, "কর্ম্মে যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়ে আসবে, তখন তোরই আত্মা সর্ব্বজীবে সর্ব্বঘটে বিরাজমান, এ তত্ত্বও দেখতে পাবি।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "পরার্থে সেবাপর হ'তে হ'তে সাধকের জীবন্মুক্ত অবস্থা ঘটে।" এই সকল প্রমাণমূলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত নারায়ণ-উপাসনা বেদান্ত-

বাক্যের ন্যায় অসংসর্গাত্মক অবাক্যার্থক অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের একটি অভিনব উপায়।

অনেকে বেদান্তের সঙ্গে এই নরনারায়ণ-সেবার সামঞ্জস্য দেখিতে পান না। তাঁহারা বলেন, বেদান্তমতে জগৎ মিথ্যা এবং দ্বৈতবোধ মায়ামাত্র; এ জন্য নরনারায়ণ-সেবা নিরর্থক। কিন্তু তাঁহারা তলাইয়া দেখেন না যে, জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিলেই উহা কার্যতঃ তৎক্ষণাৎ মিথ্যা হয় না এবং দ্বৈতবোধকে মায়ামাত্র বলিলেই সঙ্গে সঙ্গেই যথার্থ মায়া হইয়া দাঁড়ায় না। এ জন্য বৈদান্তিকের পক্ষেও শাস্ত্রানুসারে প্রথমতঃ সাধনচতুষ্টয়াদি উপাসনা আবশ্যক। সত্য বটে, আচার্য শঙ্কর অজ্ঞান-নিবৃত্তি ও অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান কোন কর্ম-অপেক্ষিত বলিয়া স্বীকার করেন নাই, অর্থাৎ তিনি জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় সমর্থন করেন নাই, কিন্তু তিনিও প্রসংখ্যান (ব্রহ্ম বা আত্মাসন্ধানমূলক উপাসনা) দ্বারা অজ্ঞান-নিবৃত্তির এবং অপরোক্ষানুভূতির প্রতিবন্ধ বিদূরিত হয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এতদুভয়ের পার্থক্য রাত্রির অপগম ও সূর্যের উদয়ের মধ্যবর্তী অবস্থার ন্যায় অতি সামান্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পক্ষান্তরে, বেদান্তের সকল আচার্যই সর্বভূতে আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শনই যথার্থ মুক্তি বলিয়া সমস্বরে প্রচার করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত নর-নারায়ণসেবা এই আত্মজ্ঞান

বা ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ উপায়। নরনারায়ণ-সাধকের দৃষ্টিতে সকল নরনারী তাঁহার সঙ্গে একাত্মক বা অভেদাত্মক। এজন্য নরকে অভিন্নাত্মকভাবে নারায়ণজ্ঞানে সেবা, আর আপনি আপনাকে অভেদাত্মক নারায়ণবোধে সেবা একই কথা। কোন মানুষ যেরূপ নিজেকে নিজে অথবা নিজেই নিজের কোন অঙ্গের সেবা করিলে উহাকে সেবা মনে করে না, নরনারায়ণ-সাধকও সেইরূপ অপরের সেবাকে সেবা বলিয়া গণ্য করেন না। ইহা তাঁহার নিকট যথার্থই নিজেই নিজের কোন অঙ্গের সেবার ন্যায় অত্যন্ত স্বাভাবিক। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত নর-নারায়ণবাদ এইরূপ অভিন্নাত্মকভাবে নারায়ণরূপে মানুষের সেবা করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে উদ্বুদ্ধ করে। ইহার তুল্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানুষের পক্ষে আর নাই— থাকিতেও পারে না।

কেবল মুক্তিলাভের উপায়ের দিক দিয়াই নরনারায়ণ-ভাবের মাহাত্ম্য নয়, পরন্তু মানুষকে মানুষের নিকট সম্মানের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত করার দিক দিয়াও ইহার মহত্ত্ব অসাধারণ। নর-নারায়ণবাদের মূলতত্ত্বই এই যে, মানুষ কেবল পঞ্চভূতের সমবায়ে নির্মিত নশ্বর দেহধারী জীবমাত্র নয়, পরন্তু আত্মরূপে সে সচ্চিদানন্দ নারায়ণ। হিন্দুর সকল শাস্ত্রই এই বাক্য সমর্থন করেন। এই সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শৈবসিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব, শাক্ত, এমন কি

বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি যে-কোন সম্প্রদায় এ ভারতে উঠিয়াছে, সকলেই এইখানে একবাক্য যে, 'এই জীবাত্মাতেই' অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, পিপিলিকা হইতে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে সেই 'এক আত্মা', তফাৎ কেবল 'প্রকাশের তারতম্য', 'বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ' (পাতঞ্জল যোগসূত্র)। অবকাশ ও উপযুক্ত দেশ-কাল পেলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু বিকাশ হোক বা না হোক, সে শক্তি প্রত্যেক জীবে বর্ত্তমান—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "অবতার, সিদ্ধপুরুষ এবং জীবে শক্তি লইয়াই প্রভেদ।" প্রকৃতপক্ষে এক আত্মরূপী সর্ব্বশক্তিমান্ নারায়ণ সকলের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান, কাজেই মানুষ মানুষের দয়ার পাত্র 'কৃষ্ণের জীব' নয়, পরন্তু পরম শ্রদ্ধার পাত্র শিব। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে এই শ্রদ্ধা পরিপূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির-প্রাঙ্গণে আহূত দরিদ্রদের ভোজনাবশেষ পূর্ণব্রহ্ম-নারায়ণের প্রসাদরূপে পরমশ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নরনারায়ণ-তত্ত্ব এতকাল জটিল দার্শনিকতার আবরণে আচ্ছন্ন ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ এই আবরণ উন্মোচন করিয়া মানুষকে মানুষের উপাস্য বিগ্রহে পরিণত করিয়াছেন। আপনাকে স্বরূপতঃ নারায়ণরূপে দর্শন এবং অপরকে নারায়ণরূপে সেবায় এই

দার্শনিক তত্ত্বের সার্থকতা নিহিত। শাস্ত্রও বলেন, "শিবো ভূত্বা শিবং যজেৎ"—'শিব হইয়া শিবের যজন করিবে', "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"—'দেব হইয়া দেবতার যজন করিবে।' ঠিক এইরূপ নরনারায়ণ-সেবায়ও সেব্য ও সেবক একই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। এই সেবার অধিকার বা সুযোগ-দানের জন্য সেব্যের প্রতি সেবককে আন্তরিক কৃতজ্ঞ থাকিতে হয়। ইহাই নরনারায়ণ-সেবার বিশেষত্ব।

ইহাতে স্পষ্ট যে, নরনারায়ণবাদ মানুষকে যেরূপ মহিমান্বিত করিয়াছে—মানুষের যেরূপ মূল্য স্বীকার করিয়াছে এরূপ আর দেখা যায় না। এতকাল অধিকাংশ ধর্মের অধিকাংশ পুরোহিত ভগবানকে জীবের পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ডদাতারূপে আকাশের ঊর্ধ্বে স্বর্গনামক কল্পনাতীত সুখের স্থানে রত্ন-সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন! তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন যে, মানুষমাত্রই তাহার পূর্বজন্মকৃত পাপের দণ্ড ভোগ করিবার জন্য এই জগদ্রূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে! সর্বশক্তিমান্ ভগবানের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া এ জগতের সকল দুঃখ সহিয়া যাওয়া ভিন্ন তাহার আর অন্য উপায় নাই! এইভাবে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" ভগবানের সিংহাসনের বেদীমূলে মানুষকে উৎসর্গ করা হইয়াছে! মানুষও সকল দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায় ভগবানের একমাত্র

প্রতিনিধি পুরোহিতদের আদেশ-উপদেশ ভয়ে ভয়ে পালন করিতেছে! পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মের অধিকাংশ পুরোহিতই মানুষকে পাপী তাপী ও ভগবানের দয়াভিখারী একান্ত অকিঞ্চিৎকর জীব বলিয়া প্রচার করেন। ইহার প্রভাবে সমাজও মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদা ও মূল্য স্বীকার করে না। শাস্ত্রের জীবব্রহ্মবাদ—মানবাত্মার মহিমা শাস্ত্রেই নিবদ্ধ আছে। ভগবান্ যে আপন বিভূতি আবৃত করিয়া আত্মরূপে নারায়ণরূপে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ, ইহা গোপন করিয়া সমাজপতিগণ সমাজে ভেদ-বিরোধের প্রশ্রয় দিতেছেন। মানুষ যে নশ্বর দেহধারী বদ্ধ জীবমাত্র নয়, সে যে আত্মরূপে নিত্যমুক্ত শিব—নররূপে নারায়ণ, ইহা জোরের সহিত প্রথম প্রচার করিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার প্রচারিত নর-নারায়ণবাদ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নরনারীকে সম্মানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে এবং অতি দীনহীন অবজ্ঞেয় অস্পৃশ্য অদর্শনীয় ও অন্যের পরিত্যক্ত তণ্ডুলকণা-অন্বেষণে ব্যাপৃত ভিক্ষুকের মস্তকেও সম্ভ্রমের রাজমুকুট পরাইয়া দিয়াছে।

বর্তমানে বিশ্বময় এক মানুষ অপর মানুষকে—একজাতি অপর জাতিকে নিতান্ত নির্মমভাবে ধ্বংসের কবলে নিক্ষেপ করিয়াও ভোগ-স্বার্থ চরিতার্থ করিতেছে। এ যুগে মানুষের হাতে মানুষের লাঞ্ছনা—মানবতার অবমাননা—মানুষের প্রতি

মানুষের হীন দৃষ্টি এবং প্রভুত্বব্যঞ্জক ও অপমান-অসম্মান-সূচক ব্যবহার চরমে উঠিয়াছে! মানুষের প্রতি জিঘাংসায় মানুষ বনের হিংস্র জন্তুকেও অতিক্রম করিয়াছে! প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের শক্তিমান্ উন্নত জাতিসমূহ তাহাদের জাতীয় উন্নতি ও স্বদেশসেবার পুণ্য নামে পৃথিবীর দুর্বল ও অনুন্নত জাতিগুলির সর্বস্ব হরণ করিতেছে! বিশ্বে শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও সভ্যতাবিস্তারের নামে তাহারা পৃথিবীর অগণন নর-নারীকে বিনাশের পথে পাঠাইয়াও আপনাদের ভোগ-স্বার্থ চরিতার্থ করিতে দ্বিধা করিতেছে না! পাশ্চাত্ত্য জাতির দৃষ্টিতে অ-পাশ্চাত্ত্য অ-শ্বেত অ-খৃষ্টান মানুষ নয়, তাহারা অসভ্য বর্বর! অ-পাশ্চাত্ত্যের প্রতি পাশ্চাত্ত্যের এই দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্বের ভোগের উপকরণরাশি লইয়া তাহাদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাই আধুনিক বিশ্বব্যাপী অশান্তির মূলে বিদ্যমান। ভারতবর্ষেও ধর্মের নামে, সমাজের নামে, সম্প্রদায়ের নামে, অধিকারবাদের নামে, রাজনীতির নামে মানুষে মানুষে বিরোধ-বিদ্বেষমূলক নানাবিধ ভেদ-বিদ্বেষ অদ্যাবধি অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে। এইগুলি স্মরণাতীত কাল হইতে আজও আমাদের জাতীয় জীবনকে বহুবিধ দুঃখ দৈন্য ও দুর্দশায় জর্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং চক্ষের সম্মুখে দেখা যাইতেছে যে, কি পাশ্চাত্ত্যে কি প্রাচ্যে এক জাতির প্রতি অপর জাতির, এক মানুষের প্রতি

অপর মানুষের জঘন্য দৃষ্টি ও ভাবপোষণ এবং তদনুরূপ ব্যবহার—অপরের ন্যায্য স্বত্ব ও অধিকার নষ্ট করিয়া আপন স্বার্থ-সাধন করিবার প্রয়াসই মানবজাতির সর্ববিধ সমস্যার মূলকারণ। কাজেই যতদিন এই কারণগুলি থাকিবে, ততদিন মানুষে মানুষে বিরোধ-বিদ্বেষ-সমস্যার সমাধান হইবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত নরনারায়ণবাদ এই সমস্যা-সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায়। মানুষ যদি সর্বোৎকৃষ্ট নীতির দিক দিয়াও মানুষকে নারায়ণ মনে করে, তাহা হইলে মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার চূড়ান্ত সমদর্শনমূলক হইবে। মানুষ যদি মানুষকে আত্মস্বরূপে অভিন্ন মনে করে, তাহা হইলে মানুষের সহিত মানুষের সকল সম্বন্ধ কল্পনাতীত সাম্য-মৈত্রীর আকার ধারণ করিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ"—'আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত প্রত্যগাত্মা।' অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "সমোঽহং সর্বভূতেষু—'আমি সর্বভূতে সমানভাবে বিরাজিত।' সুতরাং সকল মানুষ আত্মার দিক দিয়া এক ও অভিন্ন। এরূপ ক্ষেত্রে অপরকে ঘৃণা করা, অপরকে হীনদৃষ্টিতে দেখা, অপরের ন্যায্য অধিকার নষ্ট করা, আর আপনি আপনাকে ঘৃণা করা, আপনি আপনাকে হীন দৃষ্টিতে দেখা, আপনি আপনার অধিকার নষ্ট করা কি একই কথা নহে? ইহা হইতে সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয় যে, বেদান্তের জীব-ব্রহ্মতত্ত্বের

উপর প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ-বাদে যে চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রী প্রকট, ইহা অপেক্ষা উন্নত সাম্য-মৈত্রী মানুষের কল্পনারও বহির্ভূত। স্বামী বিবেকানন্দ মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে এই বেদান্তবেদ্য সর্বোত্তম সাম্য-মৈত্রীর আদর্শে ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র প্রমুখ মানব-জীবনের সকল বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার এই উপদেশ-প্রচার এবং ইহাকে কার্যে পরিণত করাই বিশ্বমানবের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ পথ।

বন্ধন-মুক্তির মহত্ত্ব-কীর্তনে

স্বামী বিবেকানন্দ

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র গ্রন্থাবলী হইতে উদাত্ত স্বরে উদ্‌গীত হইতেছে—'বন্ধন খোল, বন্ধন খোল, বন্ধন খোল! আপনার বন্ধন খোল, অপরের বন্ধন খোল! আপনি বন্ধনমুক্ত হও, অপরকে বন্ধনমুক্ত কর!' অধীনতা বা বন্ধনই সকল দুঃখ ও অশান্তির উৎস এবং স্বাধীনতা বা মুক্তিই সকল সুখ ও শান্তির কারণ। মানুষের সর্ববিধ উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বাধীনতা বা বন্ধন-মুক্তি। ধর্মে সমাজে রাষ্ট্রে চিন্তায় ও কার্যে স্বাধীনতাই মানুষের উন্নতি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মুখ্য সহায়। এই স্বাধীনতা লাভ করিতে বা অধীনতার বন্ধনমুক্ত হইতে হইলে চাই—পরাধীনতাকে অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ বলিয়া বোধ—বন্ধনের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ—দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার ঐকান্তিক আগ্রহ। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহারই নাম মুমুক্ষুত্ব।

আমরা দেখিতে পাই—যে যে বন্ধনকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলিয়া মনে করে, সে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যে বন্ধনকে দুঃখের কারণ বলিয়া মনে করে না, সেই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টাও তাহার দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, যে-সকল ব্যক্তির বন্ধনেই সুখ, 'যাঁহারা অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ অনুভব করিতে আগ্রহান্বিত' তাঁহাদিগের নিকট সর্ব-বন্ধনমুক্তির মহত্ত্ব-কীর্তন একেবারে নিরর্থক। তাঁহারা জানিয়াও জানেন না যে, বন্ধনসহায়ে কখনও বন্ধন নষ্ট হইতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে? কার কেটেছে?" যাঁহারা সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া যথার্থই মুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের জানা দরকার যে, এই অবিদ্যাশ্রিত অপূর্ণ জগতে ভাল-মন্দ এবং সুখ-দুঃখ উভয়ই আপেক্ষিক এবং এই জন্য বন্ধনের কারণ। স্বামীজি বলিয়াছেন, "মুক্তি অর্থে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—ভাল-মন্দ উভয়ের বন্ধন থেকেই মুক্ত হওয়া। লোহার শিকলও শিকল, সোনার শিকলও শিকল।" কাজেই পরিপূর্ণ মুক্তি এই উভয় বন্ধনের এলাকার বহির্দেশে। কিন্তু সাধারণতঃ এই দুইটি পরস্পর আপেক্ষিক বন্ধন

একই সময়ে দূর কবিবার উপায় নাই। এইজন্য সর্ববন্ধন-বিমুক্ত হইতে হইলে প্রথমতঃ ভালসহায়ে মন্দবন্ধন-ত্যাগ, পরে ভালবন্ধনকেও পরিত্যাগ করিয়া উভয় বন্ধনের সম্পূর্ণ বাহিরে যাইতে হইবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহা ভিন্ন সর্ববন্ধনবিমুক্তির আর কোন সোজা পথ নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণগত দেহ মন ও ইন্দ্রিয়াদির সর্ববিধ বন্ধন-মুক্তিই যথার্থ পরিপূর্ণ মুক্তি—ইহাই বৌদ্ধমতে নির্বাণ।

সকল মানুষের পক্ষেই ব্যাধি শোক দুঃখ কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষা বিদ্বেষ বাসনা প্রভৃতি আভ্যন্তর বন্ধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই বন্ধনগুলি কেবল ব্যক্তিগত অনিষ্টের হেতু নয়, অধিকন্তু পরিবার সমাজ জাতি শ্রেণী সংঘ স্বদেশ ও পৃথিবীর সকল নরনারীর অকল্যাণের হেতু। আজ যে বিশ্বময় মানুষের অত্যুগ্র জিঘাংসা, উচ্ছৃঙ্খল ভোগ, পরধন-লিপ্সা প্রভুত্ব স্বার্থ বিরোধ ও বিদ্বেষের প্রাধান্য চলিতেছে, ইহা এই সকল বন্ধনেরই কুফল! এই আভ্যন্তর বন্ধনগুলি মানুষের বাহ্যিক ও আত্মিক উন্নতি-পথের প্রবল বিঘ্ন। এতদ্ভিন্ন অধীনতা দারিদ্র্য অশিক্ষা কুশিক্ষা কুশাসন সাম্প্রদায়িকতা দুর্নীতি কুসংস্কার প্রভৃতি বাহ্য বন্ধনও মানুষের পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়! এই বন্ধনগুলি জাতির পক্ষে মহা অনিষ্টের কারণ। কেননা,

এইগুলি মানুষমাত্রেরই মনুষ্যত্ব পঙ্গু করিয়া তাহাকে পশুস্তরে উপনীত করে। এই জন্য এই বহিঃস্থ বন্ধনগুলি মানুষের বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়বিধ উন্নতি—বিশেষ করিয়া আত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক। এই কারণে এই উভয় প্রকার বন্ধন-দূরীকরণের উপরই মানুষমাত্রেরই সর্বাঙ্গীণ মুক্তি এবং পরিপূর্ণ শান্তি নির্ভর করে। এই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের সর্ববন্ধনমুক্তির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

অনেকে বর্ণে গন্ধে গানে ছন্দে এবং ইন্দ্রিয়দ্বারা সেবা করিয়া রসস্বরূপ ভগবানের সৃষ্টিতে তাঁহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম ও আনন্দরস উপভোগ করিতে উপদেশ দেন। সত্য বটে অতি মুষ্টিমেয় অসাধারণ সাধক এইরূপে প্রবৃত্তি-পথে রস-সাধনায় সিদ্ধকাম হইয়াছেন, কিন্তু সাধারণ সাধক-সাধিকার পক্ষে এই প্রবৃত্তি-মূলক সাধন—দশটি ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রেমময় ভগবানের সেবা করিবার চেষ্টা প্রচ্ছন্ন ভোগচরিতার্থতারই একটি আবরণ মাত্র! এই ভোগমূলক সাধনা সাধারণ সাধক-সাধিকার বন্ধন আরও দৃঢ় করে, তাঁহাদের এই বন্ধন—এই 'মোহ' কখনও 'মুক্তি' রূপে জ্বলিয়া উঠে না! এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রসার উপনিষদ্ নিবৃত্তি-পথাশ্রয়ে দেহ মন ইন্দ্রিয়াদির সর্ববন্ধন-বিমুক্তিই যথার্থ বন্ধন-মুক্তি বলিয়া ঘোষণা

করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "বাসনা জয় না করলে মুক্তি নেই। যে প্রকৃতির দাস, সে কখনও মুক্ত হতে পারে না। বৈরাগ্য—বিষয়বিতৃষ্ণা না হলে, কাকবিষ্ঠার ন্যায় কাম-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে, ব্রহ্মার কোটিকল্পেও মুক্তি নেই। জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, তপস্যা কেবল তীব্র বৈরাগ্য আনবার জন্য। তা যার হয়নি, তার জান্‌বি—নোঙ্গর ফেলে নৌকার দাঁড়-টানার মত হচ্ছে!"

এই জন্য স্বামীজি উপনিষদের সঙ্গে সমস্বরে বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়বিধ বন্ধন দূর করিতে সকল নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন এবং শিক্ষা নিবৃত্তি সংযম ও ত্যাগ-সহায়ে বাহ্য ও অন্তঃ প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণগত সর্ববন্ধন-বিমুক্ত হইতে সকলকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আত্মামাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃ প্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম্ম (কর্ম্মযোগ), উপাসনা (ভক্তিযোগ), মনঃসংযম (রাজযোগ) অথবা জ্ঞান (জ্ঞানযোগ), ইহাদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়দ্বারা আপনার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র বা অন্য বাহ্য ক্রিয়া-কলাপ উহার

গৌণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র।" সকল মানুষের সকল অশান্তি ও দুঃখ চিরতরে দূর করিয়া তাহাদিগকে শাশ্বত শান্তি ও সুখের অধিকারী করা এবং পরিশেষে সুখ দুঃখ উভয় বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করাই এই উপদেশদানের একমাত্র উদ্দেশ্য।

উপনিষৎ সর্ববন্ধনবিমুক্তির মাহাত্ম্য-প্রচারে পঞ্চমুখ। এই জন্য বন্ধন-মুক্তির বাণী প্রচার করিতে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদের উপর অত্যন্ত জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা উপনিষদের মূলমন্ত্র। জগতের মধ্যে ইহাই একমাত্র শাস্ত্র, যাহাতে উদ্ধারের (salvation) কথা বলে না—বলে প্রকৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হও, দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হও।" পুরোহিতগণ এতকাল আপনাদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং তাঁহাদের আদেশ-উপদেশ অনুসারে কার্য্য করাই মানুষের পাপ-তাপ হইতে মুক্তি-লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন! কিন্তু উপনিষৎ মানুষকে পাপি-তাপী বলিয়া স্বীকার করেন না। এই মহৎ শাস্ত্র প্রচার করেন যে, মানুষ আত্মস্বরূপে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত ব্রহ্ম এবং সকল জ্ঞান শক্তি ও পবিত্রতার আধার। মানুষমাত্রই আত্মার দিক

দিয়া নিত্যমুক্ত শিব। অবিদ্যা বা অজ্ঞান জন্যই তিনি পাশবদ্ধ জীব বলিয়া প্রতীত। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান-রূপ মেঘ অপসারিত হইয়া জ্ঞানসূর্য্য উদিত হইলেই তিনি আপনাকে সর্ববন্ধনবিমুক্ত শিব বলিয়া প্রত্যক্ষ-ভাবে অনুভব করিবেন। 'পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব' এই শাস্ত্রবাণী অতি সত্য। অবিদ্যাই জীবের পাশ। ইহার আয়ত্তাধীন সকল জ্ঞান চিন্তা ও কর্ম দেশ-কাল-পাত্রের অন্তর্গত বলিয়া উহারা কার্য-কারণ-বন্ধনে আবদ্ধ। প্রকৃত স্বাধীনতা বা মুক্তি দেশ-কাল-পাত্র ও কার্য-কারণ-বন্ধনাশ্রিত অবিদ্যার এলাকার সম্পূর্ণ বাহিরে। অবিদ্যার গণ্ডি অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়—উহার স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া। মরীচিকার স্বরূপ জানিতে পারিলে যেরূপ মরীচিকার ভ্রম থাকে না এবং ইন্দ্রজালের রহস্য জানিলে যেরূপ উহা আর বিস্ময় জন্মাইতে পারে না, অবিদ্যার স্বরূপ বা রহস্য জানিলেও সেইরূপ উহা আর মানুষকে প্রতারিত করিতে পারে না। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, নিষ্কাম-নিঃস্বার্থ কর্ম, পরা ভক্তি ও চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা যোগ, ইহাদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়-অবলম্বনে আত্মার ব্রহ্মস্বরূপ পরিব্যক্ত করাই অবিদ্যা দূর করিবার উপায়। অবিদ্যা বিদূরিত হইলে সাধকের "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ"—'হৃদয়ের গ্রন্থিভেদ

এবং সর্বসংশয় নাশ হয়' এবং তিনি চিরতরে সর্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "অজ্ঞানই আত্মার বন্ধনের কারণ। আমরা অজ্ঞানেই বদ্ধ হইয়াছি—জ্ঞানোদয়ে উহার নাশ হইবে, আমাদিগকে অন্ধতমের অপর পারে লইয়া যাইবে। এই জ্ঞানলাভের উপায় কি? ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা এবং সর্ব্বভূতকে প্রেমদ্বারা সেই জ্ঞানলাভ হয়। ঈশ্বরে পরমানুরক্তিবলে জ্ঞানোদয় হইবে—অজ্ঞান দূরীভূত হইবে—সকল বন্ধন খসিয়া যাইবে এবং আত্মা মুক্তিলাভ করিবেন।" গীতা বলেন, "যাঁহাদের অভিমান বা মোহ অপগত হইয়াছে, যাঁহারা আসক্তিরূপ দোষ জয় করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবান, যাঁহাদের কামনাসকল বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই বিগতমোহ ব্যক্তিই সেই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হন বা মুক্তিলাভ করেন।" এই অবস্থালাভই মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ এই অত্যুন্নত আদর্শ উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্ত্য-দেশবাসীকে এই বেদান্ত-বেদ্য মুমুক্ষা বা মুক্তির বাণীই শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "পাশ্চাত্ত্যের মাটি এখন বীজ ফেলবার উপযুক্ত—খুব উর্ব্বরা।

ওদেশের লোকেরা এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে। ভোগে অতৃপ্ত হয়ে এখন তাদের মন তাতে আর শান্তি পাচ্ছে না। একটা দারুণ অভাব বোধ করছে। এই জন্যই পাশ্চাত্ত্য জাতি বর্তমানে যথার্থ ত্যাগ বা সর্ববন্ধনবিমুক্তির আদর্শ-গ্রহণের উপযুক্ত। পক্ষান্তরে ভারতের জনসাধারণ তামসিকতার গভীর গহ্বরে মগ্ন, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের পাষাণচাপে পিষ্ট এবং মহাতম ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বলিয়া সর্ববন্ধন-বিমুক্তির উচ্চ আদর্শ গ্রহণে একেবারে অনুপযুক্ত! এই অত্যুচ্চ আদর্শ ভারতবাসীর মজ্জাগত হইলেও এই সকল কারণে তাহারা এই আদর্শে উপনীত হইতে বর্তমানে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এইজন্য স্বামীজি রজোগুণে উদ্দীপিত করিয়া কর্মতৎপরতার দ্বারা সর্বাগ্রে তাহাদের ঐহিক অভাবগুলি দূর করিবার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশবাসিগণ-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "শরীরে বল নেই—হৃদয়ে উৎসাহ নেই—মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই!—কি হবে রে, এই জড়পিণ্ডগুলোর দ্বারা? আমি নেড়ে চেড়ে এদের ভিতর সাড় আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' এই অভয়বাণী শুনাতেই আমার জন্ম। তোরা এই কার্যে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে গাঁয়ে, দেশে দেশে, এই অভয়বাণী আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণকে শুনাগে। সকলকে ধরে

ধরে বলগে, তোমরা অমিতবীর্য্য—অমৃতের অধিকারী। এইরূপে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর—জীবন-সংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর, তারপর পরজীবনে মুক্তির কথা তাদের বল। আগে ভেতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের লোক-গুলোকে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করা, উত্তম অশন-বসন—উত্তম ভোগ আগে করতে শিখুক, তারপর সর্ব্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্ত হতে পারবে, তা বলে দে।"

এই মহৎ আদর্শ সকলের সমক্ষে ধারণা করিয়া রাখিবার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করিয়াছেন। এই মঠের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, "প্রথমতঃ কতকগুলো ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলো বালসন্ন্যাসীকে তাই এরূপে তৈরী কচ্ছি।" এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণ তমসাচ্ছন্ন দেশবাসীকে উপনিষদের অভয়বাণী শুনাইয়া আত্মবিশ্বাস আত্মসম্মান এবং জন্মগত স্বাধীনতা স্বত্ব ও অধিকারে প্রবুদ্ধ করিবেন, তাহাদের অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ণকুটিরে জ্ঞানের বাতি জ্বালাইবেন, জাতিধর্মনির্বিশেষে জনসাধারণের উত্তম খাদ্য, উত্তম বস্ত্র, উত্তম আবাস, উত্তম শিক্ষা, উত্তম ভোগ এবং রোগে উত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা

করিবেন এবং শেষে শাশ্বত সুখ ও শান্তি-লাভের উপায়রূপে তাহাদিগকে বেদান্তের সর্ববন্ধন-বিমুক্তির বার্তা শুনাইবেন— ইহাই ছিল স্বামীজির আন্তরিক অভিপ্রায়। তিনি বোধিসত্ত্বগণের ন্যায় আপন মুক্তি-কামনাকেও তুচ্ছ করিয়া সকল নরনারীকে সর্ববন্ধনমুক্ত করিতে মঠের সন্ন্যাসিগণকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? মুক্তিকামনাও তো মহাস্বার্থপরতা। ফেলে দে মুক্তি—আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা।" অন্যত্র—'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' সন্ন্যাসীর জন্ম। যথার্থ সন্ন্যাসীরা নিজেদের মুক্তি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করেন—জগতের ভাল করতেই তাঁদের জন্ম। সন্ন্যাসগ্রহণ করে যারা এই ideal (উচ্চ লক্ষ্য) ভুলে যায় 'বৃথৈব তস্য জীবনম্'।"

দেখা যায়—যাঁহারা নিজের বন্ধনমুক্তি উপেক্ষা করিয়া অপরের বন্ধন-মুক্তির জন্য আপন জীবন বিলাইয়া দিয়াছেন— যাঁহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশ জাতি সমাজ ও ব্যক্তির হিতার্থে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, পৃথিবীর সকল নরনারী সেই মহাত্যাগী মহাপুরুষগণের পুণ্যস্মৃতির প্রতি চিরকাল শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও যে করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, যাঁহারা অপরের বন্ধন ও দুঃখ-দৈন্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া কেবল নিজের মুক্তি ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন—যাঁহারা পরার্থে একেবারেই না ভাবিয়া

সমগ্র জীবন কেবল নিজের স্বার্থসুখেই ইন্ধন যোগাইতেছেন, পৃথিবীর মানব-সমাজ সেই স্বার্থপর ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে চিরকাল অভিশাপ বর্ষণ করিতেছে। বৌদ্ধধর্মে প্রথমোক্ত মতাবলম্বিগণ অসাধারণ ঔদার্য্য ও পরার্থপরতার জন্য 'মহাযানী এবং শেষোক্তপন্থিগণ অত্যন্ত সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার জন্য 'হীনযানী' নামে অভিহিত। মহাযান-শাস্ত্র বলেন, পঞ্চ বোধিসত্ত্ব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর সকল প্রাণী মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা বারংবার জন্মগ্রহণ এবং তজ্জনিত শত দুঃখভোগ করিয়াও সকলকে মুক্তিলাভে সাহায্য করিতে থাকিবেন। এই জন্য করুণার মূর্তপ্রতীক বোধিসত্ত্বগণ মহাযানীদের হৃদয়দেবতা। তুলনামূলক আলোচনা করিলে জানা যায়—সকল দেশের ধর্ম-প্রবর্তকমাত্রই করুণার বিগ্রহ-স্বরূপ বোধিসত্ত্বগণের ন্যায় স্বেচ্ছায় অশেষ দুঃখবরণ করিয়াও সকল নরনারীকে সকল দুঃখের বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। এই অনন্যসাধারণ মহত্ত্বমণ্ডিত আত্মত্যাগের জন্যই এই মহাপ্রাণ মহাত্মাগণ পৃথিবীর স্বার্থসর্বস্ব সাধারণ মানুষের আদর্শ। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ সকল নর-নারীকে এই মহান আদর্শের অনুসরণ করিতে বারংবার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার এই অমূল্য উপদেশ-প্রতিপালনই ব্যক্তি ও জাতির সকল সমস্যা-সমাধান এবং সর্ববন্ধন-মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়।

স্বদেশ-প্রেমের মর্মস্পর্শী বাণী-প্রচারে

স্বামী বিবেকানন্দ

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের উচ্ছ্বসিত স্বদেশ-প্রেমের মর্মস্পর্শী যে বাণীসমূহ পরাধীনতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত অবস্থায়ও ভারতের প্রাচীন মহত্ত্ব—তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের প্রতি সকলের শ্রদ্ধাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং যে বাক্যাবলীর সম্মোহিনী শক্তি শত শত সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া স্বদেশ-সেবায় জীবনোৎসর্গ করিতে সম্বুদ্ধ করিয়াছিল, উহাদেরই কয়েকটি মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"এখন আমি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম, কিন্তু হায়, এদেশের জনসাধারণের ভীষণ দারিদ্র্য ও শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আমি কিরূপ ব্যথিত, মর্মাহত

হইয়াছি তা কি বলিব! চক্ষুর অশ্রুধারা রুদ্ধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ইহাদের দারিদ্র্য ও যন্ত্রণা দূরীভূত না করিয়া ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করা বৃথা প্রয়াসমাত্র। এই কারণেই, ভারতের দীনদরিদ্র জনসাধারণের মুক্তির উপায়-নির্দ্ধারণের জন্যই আমি আমেরিকা যাইতেছি।"

"মাতঃ, আমি নাম যশ দ্বারা কি করিব যখন আমার জন্মভূমিকে অসীম দারিদ্র্যের অতলে নিমজ্জিত হইতে দেখিতেছি! ওহো, আমরা দরিদ্র ভারতবাসীরা কি দারুণ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি! লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী একমুষ্টি অন্নের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, আর এদেশের (আমেরিকার) লোকেরা ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। কে ভারতের ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণের মুখে অন্ন যোগাইবে, কে তাহাদিগকে এই হীন অবস্থা হইতে উত্থিত করিবে? মাতঃ, কি প্রকারে আমি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারি তাহা আমাকে দেখাইয়া দাও।"

"ভারতবর্ষে দীনহীন লোককে আমরা কি চক্ষে দেখিয়া থাকি তাহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় দারুণ ব্যথায় অস্থির হইয়া উঠিল। এই অবনত অবস্থা হইতে উঠিবার, এই দুর্দশা হইতে উদ্ধারের কোন সুযোগ, কোন উপায় তাহারা খুঁজিয়া

পাইতেছে না। * * দিন দিন তাহারা দুর্গতির অতলে ডুবিতেছে। নিষ্ঠুর সমাজ তাহাদের উপর যে মুষ্টির আঘাত বর্ষণ করিতেছে, তাহা তাহারা অনুভব করিতেছে, অথচ জানে না—কোথা হইতে তাহারা আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ। ইহার পরিণামই দাসত্ব। ওহে উৎপীড়ক দুরাত্মাগণ, তোমরা জান না—উৎপীড়ন এবং দাসত্ব একই জিনিষের এপিঠ এবং ওপিঠ, দাসত্বই উৎপীড়কের ভাগ্যলিপি।"

"হে বৎসগণ, তোমরা মহৎ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হও। প্রভু আমাকে এই জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এ জীবনে যন্ত্রণা, কত পীড়ন সহ্য করিয়া আমাকে আসিতে হইয়াছে, প্রাণাধিক প্রিয়তমের অনশনে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাকে দেখিতে হইয়াছে। লোকে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে এবং যাহারা আমাকে বিদ্রূপ করিয়াছে তাহাদের প্রতি সহানুভূতির জন্য আমাকে ভুগিতে হইয়াছে। একমাত্র আশা তোমাদের উপর, যাহারা নিরহঙ্কার, নম্রস্বভাব, নীচ কিন্তু ভগবানে বিশ্বাসী। * * তোমরা দীনদুঃখীর দুঃখ নিজের হৃদয়ে অনুভব কর এবং সাহায্যের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, তবেই তোমরা সাহায্য পাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই দুঃখের বোঝা হৃদয়ে বহন করিয়া, এই চিন্তা মস্তকে লইয়া বহু বৎসর দেশে ভ্রমণ করিয়াছি,

তথাকথিত ধনবান ও মহাজনদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি। এখন ব্যথাদীর্ণ রক্তাক্ত হৃদয়ে অর্দ্ধ ভূমণ্ডল অতিক্রম করিয়া সাহায্যের জন্য এই বিভুঁই বিদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। প্রভু দয়াময় সুমহান্, আমি জানি তিনি আমার সহায় হইবেন। আমি শীতে অথবা অনাহারে মরিতে পারি; কিন্তু হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, মূর্খ, পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই সংগ্রাম দায়স্বরূপ তোমাদের জন্য রাখিয়া যাইব! * * হাঁ, প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম কর, তোমাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ কর, আত্মবলিদান কর এই ত্রিশ কোটি লোকের মুক্তির জন্য, যাহারা প্রতিদিন ডুবিতেছে। * * প্রভু ধন্য, আমরা জয়ী হইবই। এই সংগ্রামে শত শত যোদ্ধা মরিবে, শত শত আবার যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইবে। চাই বিশ্বাস, চাই সমবেদনা, জলন্ত বিশ্বাস, জ্বলন্ত সহানুভূতি নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া, শীত অনশনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অগ্রসর হও। প্রভু আমাদের সেনাপতি,—প্রভুর জয়।"

"লোকে patriotism অর্থাৎ দেশানুরাগের কথা বলে। আমিও 'পেট্রিওটিজমে' বিশ্বাসী। আমারও দেশানুরাগের আদর্শ আছে। মহৎ কার্য্যের জন্য তিনটি জিনিষের আবশ্যক। প্রথমটি হইতেছে হৃদয়বত্তা। আমাদের বুদ্ধি বা যুক্তি (reason) কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া

থামিয়া যায়, কিন্তু হৃদয় হইতেই প্রেরণা আসে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে, প্রেমই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রহস্যে প্রবেশ করিবার দ্বার। অতএব, হে স্বদেশভক্ত সংস্কারকবৃন্দ, ভালবাস, অনুভব করিতে শিক্ষা কর। তোমরা কি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছ যে, দেব ও ঋষিগণের কোটি কোটি বংশধর প্রায় পশুর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি নরনারী বহু যুগ ধরিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ, অজ্ঞতার কাল মেঘ সমগ্র ভারত-গগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় কি তোমরা বিনিদ্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করিতেছ? * * এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের এই দুর্দশা দূর করিবার কথাই কি তোমাদের একমাত্র চিন্তার বিষয়, ধ্যানের বিষয় হইয়াছে? এই চিন্তায় মগ্ন হইয়া তোমরা কি তোমাদের মান, যশ, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি এমন কি দেহ পর্য্যন্ত ভুলিয়াছ? যদি এইরূপ করিয়া থাক তবে তোমরা প্রথম সোপানে, স্বদেশানুরাগের প্রথম সোপানে পৌঁছিয়াছ। তোমরা অনেকেই জান যে আমেরিকায় ধর্মমহাসভার জন্য আমি যাই নাই। দেশের জনসাধারণের দুর্দ্দশামোচনের চিন্তা ভূতের মত

আমার চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। দ্বাদশ বৎসর সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ঐ বিষয়ে কার্য্য করিবার কোন উপায় ও সুবিধা পাইলাম না। এ জন্যই আমাকে আমেরিকায় যাইতে হইয়াছিল। ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশন হউক বা না হউক, তাতে আমার কি যায় আসে? এখানে, আমার স্বদেশে, আমার রক্তমাংসস্বরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে, তাহাদের কথা কে ভাবে?"

"জগজ্জননী তোমাদের স্বদেশ, স্বজাতিরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। আগামী পঞ্চাশ বৎসর এই মাতৃভূমিই তোমাদের একমাত্র আরাধ্যা দেবী হউন। * * অন্যান্য দেবতা নিদ্রিতা, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রতা—তোমাদের স্বদেশীয় জনসাধারণ, সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত পদ, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। কোন্ নিষ্ফলা দেবতার সন্ধানে তোমরা ধাবিত হইবে, আর তোমাদের সম্মুখে, তোমাদের চতুর্দ্দিকে যে জাগ্রত দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পার না? এই দেবতার পূজা সম্পন্ন হইলে পর তোমরা অপর দেবতার পূজা করিতে সক্ষম হইবে। * * তোমরা প্রত্যেকেই যোগী হইতে চাহিতেছ, প্রত্যেকেই ধ্যান করিতে চাহিতেছ! ইহা যে অসম্ভব। সমস্ত দিবস সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া অর্থের সন্ধানে উন্মত্তবৎ ছুটিবে, আর সন্ধ্যাবেলায় অল্পক্ষণের জন্য

বসিয়া নাক টিপিলেই ধ্যানী যোগী হইয়া যাইবে ? ইহা এতই সহজ ? * * আবশ্যক—চিত্তশুদ্ধি ও হৃদয়ের পবিত্রতা। চিত্তশুদ্ধি কি করিয়া হইবে ? সর্ব্বপ্রথমে বিরাটের পূজা দ্বারা—যাঁহারা তোমাদের চতুর্দ্দিকে বিরাজমান তাঁহাদের পূজাদ্বারা। * * ইঁহারাই, তোমাদের স্বদেশবাসিগণই এখন তোমাদের উপাস্য দেবতা হউন। হিংসা দ্বেষ দ্বন্দ্বের পরিবর্ত্তে তোমাদের স্বদেশবাসিগণের পূজা কর। ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষরূপ মহাপাপের ফলে তোমরা দুঃখভোগ করিতেছ, তবু কি তোমাদের চক্ষু খুলিবে না ?"

"এই সেই প্রাচীন দেশ—ভারতবর্ষ, যেখানে ব্রহ্মবিদ্যা অন্য কোন দেশে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে স্বীয় বাসভবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এদেশের আধ্যাত্মিকতার মন্দাকিনী জড় জগতে, একদিকে বিশাল নদনদীরূপে সবেগে প্রবাহিত হইয়া ভারত-মহাসাগরের সহিত মিলিত, একীভূত হইয়াছে এবং অপরদিকে তুষারকিরীটী অনাদি অনন্ত হিমালয়-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর সোপানে আরোহণ-পূর্ব্বক যেন সুরলোকের রহস্যসমূহের অন্তর্দ্দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে! এই ভারতের মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণের পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে। এই দেশেই সর্ব্বপ্রথম মানব-প্রকৃতি এবং অন্তর্জ্জগৎ-সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল। এই দেশেই সর্ব্বপ্রথম মানবাত্মার অমরত্ব, ব্রহ্মের অস্তিত্ব

ঈশত্ব এবং সর্ব্বভূতান্তর্য্যামিত্ব-বিষয়ক মতবাদ উদ্ভূত হইয়াছিল। এই দেশেই ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ-সমূহ চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এই ভারতবর্ষ হইতেই আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যার তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় সমগ্র পৃথিবী বারংবার প্লাবিত করিয়াছে। আর ধ্বংসাভিমুখী জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবার জন্য এই ভারত হইতেই পুনরায় সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার প্রবল প্রবাহ সমুত্থিত হইবে। এই ভারতই শত শত শতাব্দীর আঘাত, বৈদেশিক আক্রমণ, শত শত রীতিনীতি-বিপর্য্যয় সহ্য করিয়া অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, নিজের অবিনশ্বর বিদ্যা ও জীবন লইয়া পাষাণ অপেক্ষা দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ দেশের জীবন আত্মারই মত অনাদি অনন্ত অমর, আমরা এমনি দেশের সন্তান। হে ভারতসন্তানগণ, তোমাদিগকে কতকগুলি কাজের কথা বলিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। এ দেশের অতীত গৌরবের কথা তোমাদিগকে যে উদ্দেশ্যে স্মরণ করাইয়া দিতেছি তাহা এই—লোকে আমাকে অনেকবার বলিয়াছে, অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা বৃথা, বরং তাহাতে অবনতি হইয়া থাকে। অতএব আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে ভবিষ্যতের দিকে। একথা সত্য। কিন্তু অতীতের গর্ভ হইতেই ভবিষ্যতের জন্ম হয়। অতএব অতীতের দিকে যতদূর পার দৃষ্টিপাত কর, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী

প্রবাহিতা তাহা হইতে জ্ঞানবারি আকণ্ঠ পান কর; তারপর সম্মুখ দিকে তাকাও, সম্মুখ দিকে অগ্রসর হও; ভারতবর্ষ অতীতকালে যত মহান, যত গৌরবান্বিত, যত মহিমান্বিত ছিল, তাহাকে তদপেক্ষা গরীয়ান, তদপেক্ষা মহীয়ান, অধিকতর জ্যোতিষ্মান কর। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন, ইহা আমাদিগকে প্রথমে জানিতে হইবে। পরে আমরা কি উপাদানে গঠিত, আমাদের ধমনীর শোণিতের উপকরণ কি, আমাদিগকে জানিতে হইবে। আমাদের শোণিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, তদ্দ্বারা অতীত যুগে যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস করিতে হইবে, তারপর সেই বিশ্বাস এবং অতীত মহত্ত্বানুভবের বলে অতীত ভারত অপেক্ষা বৃহত্তর, মহত্তর ভারত গড়িয়া তুলিতে হইবে।”

“যদি আমার জীবন সহস্র মানব-জীবনের মত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত, তাহা হইলে ঐ সুদীর্ঘ জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমার স্বদেশবাসী নরনারীর সেবায় উৎসর্গ করিয়া দিতাম। কারণ, আমার বলিতে যাহা কিছু আছে,—এই জড়দেহ, মননশক্তি এবং আধ্যাত্মিক সম্পদ, এই সমস্তের জন্যই আমি আমার জননী জন্মভূমির নিকট ঋণী। যদি আমি জীবনে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, তবে তাহার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব ও গৌরব আমার স্বদেশবাসিগণের প্রাপ্য; আর

আমার যত কিছু দুর্ব্বলতা, যত কিছু অকৃতকার্য্যতা তাহার জন্য আমি নিজেই দায়ী, আমার অক্ষমতাই এই সকল দুর্ব্বলতা ও অকৃতকার্য্যতার কারণ। এদেশবাসী জন্মের মুহূর্ত্ত হইতে তাহার চতুর্দ্দিকে মহতী শিক্ষা লাভ করিয়া জীবনকে মহৎ ও কৃতার্থ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আমি ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারি নাই বলিয়া আমার মধ্যে দুর্ব্বলতা রহিয়াছে।”

“আমার জন্মভূমির মত দেশ আর কোথায় আছে? যে কোন ব্যক্তি, তিনি ভারতবাসীই হউন, অথবা বিদেশী হউন, যদি তাহার আত্মা পশুত্বে পরিণত না হইয়া থাকে,—এই পুণ্যভূমিতে দণ্ডায়মান হন—তিনিই নিজেকে জীবনপ্রদ চিন্তারাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া অনুভব করেন,—যে সকল চিন্তা মানবেতিহাসের অজ্ঞাত সহস্র সহস্র শতাব্দী যাবৎ নরকুলশ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা ভারতীয় মহাপুরুষগণ মনুষ্যজাতিকে পশুত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত করিবার জন্য উদ্‌ভাবিত করিতেছেন। এদেশের পবন আধ্যাত্মিকতার স্পন্দনে তরঙ্গায়িত। এদেশ দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও উদ্‌ভাবনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। পাশবজীবনের অবিশ্রাম সংগ্রামের মধ্যে মানুষকে শান্তির আশ্রয় দিবার জন্য, এবং যে শিক্ষার ফলে মানুষ তাহার পশুত্বের বাহ্য পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া অজর অমর অনন্ত

আনন্দস্বরূপ আত্মারূপে প্রকাশিত হয়, সেই শিক্ষা দিবার জন্য এই ভারতই আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই দেশই মানব-জীবনের যাহা কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়া, আবার এজীবনের দুঃখতাপ পূর্ণতররূপে সহ্য করিয়া জগতে সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করিয়াছিল যে, এই সুখ-দুঃখময় মানব-জীবন অলীক, মায়ামাত্র। এই ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথম ভোগ-বিলাসের ক্রোড়ে লালিত, সামাজিক গৌরব-গরিমার শীর্ষদেশে আরূঢ়, অশেষ প্রতাপের অধীশ্বর নবযৌবনের প্রারম্ভে সকল মায়ার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন! সুখ-দুঃখ, অশ্রুহাস্য, ঐশ্বর্য্য-দারিদ্র্য, শক্তি-দৌর্ব্বল্য, জন্মমৃত্যুর ভীষণ সংঘর্ষের মধ্যে আবর্ত্তিত অসংখ্য মানবের বাসভূমি এই ভারতেই অনন্ত শান্তি ও অটল স্থৈর্য্যের আশ্রয় ত্যাগের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল! আমাদের এই মাতৃভূমিতেই জীবন-মৃত্যুর সমস্যা, সর্ব্বদুঃখের মূল বাসনার তীব্র দহন হইতে মানবের মুক্তির সমস্যা সর্ব্বপ্রথম মীমাংসিত হইয়াছিল; এবং তাহা এরূপভাবে হইয়াছিল যে, জগতের অপর কোন দেশ সেরূপ মীমাংসায় এ পর্য্যন্ত উপনীত হইতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না। শুধু এদেশই আবিষ্কার করিয়াছে—এই ঐহিক জীবন এক পরম সত্যের ছায়ামাত্র, অতএব অমঙ্গলের আকর। আমার এই মাতৃভূমিই একমাত্র দেশ যেখানে ধর্ম্ম জীবন্ত সত্য বলিয়া

গৃহীত এবং প্রাত্যহিক জীবনে আচরিত হইয়াছে, যেখানে নরনারী জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য দুর্জ্জয় সাহসে সমাধিগর্ভে মগ্ন হইয়াছে, যখন অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া নিজ নিজ বাসনা-পূরণের আশায় উন্মত্তের মত ধাবিত হইয়াছে। কেবল এদেশেই মানবহৃদয় এতদূর প্রশস্ত হইয়াছে যে তাহা শুধু মানুষ নহে, সমস্ত পশুপক্ষী, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিজ্জগৎকেও প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়াছে। * * কেবল এদেশেই মানবাত্মা সমগ্র বিশ্বের একত্ব অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করিয়া বিশ্বচরাচরের হৃৎস্পন্দন আপন হৃদয়ের স্পন্দন বলিয়া অনুভব করিয়াছে।”

“বিদেশী প্রচারকগণ আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মের দুর্গটি বিচূর্ণ করিয়া ভূমিসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা দেখিয়াও কি আমরা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিব? আমরা কি আমাদের প্রাচীনদের মত বীরগর্ব্বে পৃথিবীর সমুদয় জাতির নিকট আমাদের ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিব না? আমরা কি সঙ্কীর্ণ সামাজিক গণ্ডীর ভিতর ক্ষুদ্র প্রাদেশিক মনোভাব লইয়া আবদ্ধ হইয়া থাকিব, অথবা ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য জগতের নানাজাতির চিন্তাধারাকে আমাদের ধর্ম্ম-বিস্তার দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিব? নিজের পুনরুজ্জীবনের জন্য ভারতবর্ষকে প্রবল হইতে হইবে, তাহার সমস্ত জীবন্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। এই

কার্য সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই আমি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছি।”

“ভারতবর্ষের অবনতির কথা অনেকের মুখে শুনিয়া থাকি। এক সময়ে আমিও এ কথা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের অতিরঞ্জিত চিত্রের ভিতরকার প্রকৃত রূপ অবগত হইয়া এখন আমার নেত্র হইতে ভ্রান্ত সংস্কারের তিমিরাবরণ অপসারিত হইয়াছে। এখন আমি অহঙ্কারমুক্ত অকপট হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, আমার দেশকে আমি এতকাল বুঝি নাই! অয়ি পুণ্য আর্য্যভূমি! তুমি কখনও কোনও কালে পতিত, অবনত হও নাই। * * আমি ভয়বিস্ময়মিশ্রিত নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছি, অপূর্ব্বজ্যোতির্ম্মণ্ডিত যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী অবিশ্রান্ত ধারায় বহিয়া চলিয়াছে, এই দীর্ঘায়তন কাল-শৃঙ্খলের কোথাও একটু মলিনতা দৃষ্ট হইলে আবার দেখিতে পাইতেছি, পরবর্ত্তী কালে তাহাই অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। * * পাশ্চাত্ত্য দেশে নূতন সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অনেকেই ইতোমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, একমাত্র অদ্বৈত বেদান্তের আদর্শই তাঁহাদের সামাজিক আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করিতে সক্ষম হইবে।”

"জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রতা হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিতা হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে আর ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না। কুম্ভকর্ণের দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।"

"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

"আমি প্রার্থনা করি যে, আমি যেন বারংবার জন্মগ্রহণ করে' সহস্র দুঃখ সহ্য করি। যেন ঐ সকল জন্মে একমাত্র যে ঈশ্বর বাস্তবিক বর্ত্তমান, আমি একমাত্র যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী—সেই ঈশ্বরের—সমুদয় জীবাত্মার সমষ্টিস্বরূপ সেই

ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারি, আর সর্ব্বোপরি পতিত, দুঃখী, পাপী, তাপিরূপী আমার ঈশ্বর—সকল জাতির দরিদ্র-দুঃখিরূপী আমার ঈশ্বর আমার বিশেষ উপাস্য। উচ্চ-নীচ, সাধু-পাপী, দেব-কীট, উভয়রূপী সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞেয় সত্য, সর্ব্বব্যাপীর উপাসনা কর, অন্যান্য প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেল!"

"তোমরা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি নিজেদের মুক্তি পর্য্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও—যাও অপরের সাহায্য কর। তোমরা সর্ব্বদাই বড় বড় কথা কহিতেছ, কিন্তু এই তোমাদের সম্মুখে কর্ম্মপরিণত বেদান্ত স্থাপন করিলাম। তোমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হও। যদি এই জাতি জীবিত থাকে, তবে তুমি আমি, আমার মত হাজার হাজার লোক যদি অনশনে মরে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?"

"আমার জীবনের এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটি চক্র প্রবর্ত্তন করিব, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট তত্ত্বরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। * * একটি কেন্দ্র-বিদ্যালয় গঠন করিয়া সাধারণ লোকের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিত প্রচারকগণের দ্বারা গরীবদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া তাহাদের নিকট বিদ্যা ও ধর্ম্মের বিস্তার—এই ভাবগুলি প্রচার করিতে থাক।"

"লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসরূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক।"

"ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়। * * চাই—সেই যুবক যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে অন্নপ্রদান করবে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে।"

"কি জানিস? আমি চাই—A band of young Bengal—একদল জোয়ান বাঙ্গালীর ছেলে, এরাই দেশের আশা-ভরসার স্থল। চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান্, পরার্থে সর্ব্বস্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্ত্তী যুবকগণের উপরই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা। আমার ideas—ভাবসকল যারা work out—জীবনে পরিণত করে' আপনাদের ও দেশের কল্যাণসাধনে জীবনপাত করবে।"
